সৌরভ চক্রবর্তী



ব্রহ্ম হত্যা

Arajakata Exclusive

পরাধীন ভারতের প্রথম ফাঁসি
- মহারাজা নন্দকুমার

ব্রহ্মহত্যা

সৌরভ চক্রবর্তী



দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com

মাতামহ স্বর্গীয় শ্রী রবীন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী-কে। আমার জীবনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ আমাদের চলার পাথেয় হোক।

ভূমিকা

মহারাজা নন্দকুমারকে নিয়ে কাজ করার ইচ্ছেটাকে বহু বছর ধরে সযত্নে লালন পালন করছিলাম। সেভাবে সময় সুযোগ হয়ে উঠছিল না। দে'জ পাবলিশিং তরফ থেকে বই প্রকাশের প্রস্তাব যখন প্রথম এলো তখন দ্বিতীয় আর কোনো ভাবনা মনের মধ্যে জায়গা পায়নি। ঠিক করলাম যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবো এবং সেটা হবে মহারাজ নন্দকুমারের কুখ্যাত আইনি ফাঁসির মামলা।

সমাপতন আর কাকে বলে? এই ২০২৫ সালে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি আড়াইশো বছরে পড়লো। ভাবা যায়! আড়াইশো বছরের ধামা চাপা এক ইতিহাস আবার সর্বসমক্ষে আসছে এই বইয়ের মাধ্যমে।

প্রথম কবে মহারাজ নন্দকুমার-কে জানতে পারি সেটা একটা প্রশ্ন বটে। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে যখন মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি তুঙ্গে সেই সময় প্রথমবার প্রশ্নটি পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন ছিল: পরাধীন ভারতে প্রথম ফাঁসি কার হয়েছিল?

উত্তর ছিল: মহারাজ নন্দকুমার।

তারপর থেকে আর এই বিষয়ে কিছুই জানতে পারিনি। বাংলায় প্রকাশিত বইগুলো এই বিষয়ে এক আধলাইন লিখেই কলমকে বিশ্রামে পাঠিয়েছে। অথচ এই ষড়যন্ত্রের মামলা এতোই নাটকীয় যে অন্য

কোনো দেশে ঘটলে এতোদিনে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক মানের কাজ হয়ে যেত।

আজকের দিনে সহজলভ্য কোনো বইয়ে আদালতের সম্পূর্ণ ট্রায়াল নেই। অথচ এই বিষয়টি এতোই অভিনব এবং আলোচনাযোগ্য যে অনেক আগে থেকেই থাকা উচিত ছিল। তাই ইচ্ছে ছিল আমার মার্তৃভাষায় এই বিষয়ে একটা বই লিখবো যা পড়লে পাঠক এই কুখ্যাত মামলাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকবেন। সৌভাগ্যবশত এবার এই কাজটি সেরে ফেলা গেলো।

মহারাজা নন্দকুমার ছিলেন মীরজাফরের আমলে বাংলাদেশের মন্ত্রী। সেই প্রভূত ক্ষমতাশালী লোকটাকেই কিনা প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসি দেওয়া হলো? শোনা যায় গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে বিবাদের জেরেই হলো এই ফাঁসি। অথচ এই নন্দকুমারই মীরকাশেম নবাবী আমলে বক্সারের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইংরেজদের রক্ষা করেছিলেন। কোনোভাবেই দুইয়ে দুইয়ে চার করা যায় না এ এরকম এক মামলা।

ভারতে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এলাইজা (এলিজা অথবা ইলিজা) ইম্পে। এই বইয়ে এলাইজা নামটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্যার ইম্পে ছিলেম হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধু। দুই কান কাটা এই বিচারপতি কিভাবে ভরা আদালতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটার পর একটা লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত নিলেন তা আপনারা এবার জানতে পারবেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস মহারাজা নন্দকুমারকে তার ইংরেজি উচ্চারণের কারণে নানকুমার বলে ডাকতেন। এই বইয়ে যখন হেস্টিংস নন্দকুমার বলতে চেয়েছেন "নানকুমার" বলেই সম্বোধন করেছেন। বাকি ইংরেজরাও এভাবেই উচ্চারণ করতেন। তবু একটা পার্থক্য রাখার খাতিরে বাকিদের বেলায় উচ্চারণ "নন্দকুমার"-ই রাখা হয়েছে।

এই বই লেখার সময় যে ভাষায় কথা বলা হতো বা বাণিজ্যিক কাজ

যে ভাষায় সমাধা করা হতো সেগুলো আজকের দিনের পাঠকের পক্ষেও বোঝা সম্ভব না আর আমার পক্ষেও লেখা সম্ভবপর ছিল না। ফারসী, নাগরিক ভাষা, সাধু বাংলা, ইংরেজি ইত্যাদি নানান ভাষার সমাবেশ ছিল। এই বইয়ের কাহিনিতে সবার ভাষা একই অর্থাৎ আজকের সময়ের সাধারণ চলিত বাংলা ভাষা। ফলে কাহিনিটি লিখতে যেমন আমার সুবিধে হয়েছে আশাকরি পাঠকের পড়তেও সেই সুবিধে হবে।

আমাদের ইতিহাসের বই মোঘলদের ইতিহাস এতো পড়িয়েছে যে আমরা দেশীয় অনেক ইতিহাস ভুলে গেছি। এই বই সেরকমই এক হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধান করলো।

বইটির প্রচ্ছদ করেছেন শিল্পী শ্রী স্বর্ণাভ বেরা। প্রচ্ছদটি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আশাকরি আপনাদেরও এই প্রচ্ছদ ভালো লাগবে।

শিল্পী কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল বইয়ের অলঙ্করণের দায়িত্বে ছিলেন। ঠিক যেমন চেয়েছিলাম তিনি ঠিক সেরকমভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রগুলোকে। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সমস্ত কর্ণধারদের আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা সংস্থাটি প্রথমদিন থেকে আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। ফলে মনের আনন্দে কাজ করতে পেরে আমাএ অত্যন্ত ভালো লেগেছে।

আমার সহধর্মিণী এই গোটা প্রোজেক্ট চলাকালীন সময়ে আমাকে যারপরনাইভাবে সাহায্য করেছে। ভালোবাসা ছাড়া তাঁক্র আর কী-ইবা দিতে পারি। এবার ত্রিপুরা থাকাকালীন সময়ে দেখলাম আমার মা-ও আমার রাত জেগে লেখার বিষয়টিতে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। এটা একটা পাওনা বটে।

আশা রাখছি এই বইটি আগামীদিনে যারা মহারাজ নন্দকুমারকে নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইবেন তাদেরও অত্যন্ত উপকৃত করবে।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

অ্যাকাডেমিক কাজে যদি এই বইটির ব্যবহার হয় সেদিকে নজর রেখেই সমস্ত সত্য ঘটনা লেখার চেষ্টা করেছি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকটি সামলে সত্যনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের এই প্রয়াস পাঠকের জিজ্ঞাসুমনে হিল্লোল তুললে আমার সাধনা সফল।

আর কী...

পাঠ শুভ হোক।

ধন্যবাদান্তে

সৌরভ চক্রবর্তী

২৮শে জানুয়ারি,২০২৫

মেইল আইডি: authorchakraborty.sourav@gmail.com

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

লেখকের কথা

এই বইয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করার কোনোরূপ চেষ্টা করা হয়নি। বরং ইতিহাসকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে উপন্যাসের খাতিরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা ঘটনাগুলোকে কাহিনির আকারে বিবৃত করা হয়েছে। এই বইয়ে উল্লিখিত প্রত্যেকটি চরিত্র সত্য। কোনো কাল্পনিক চরিত্রের উল্লেখ এই বইয়ে নেই।

সৌরভ চক্রবর্তী

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



'আগামিকাল রাতে যেভাবেই হোক মহারাজা নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ঘরের মধ্যে যেন একটা বজ্রপাত হল। উপস্থিত সকলে রে রে করে উঠলো,

—স্যর, এ কী বলছেন? চারদিকে গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে।

এক আধিকারিক নিরস্ত করার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি জানেন সাহেব যখন একবার মনস্থির করে ফেলেছেন তখন এর অন্যথা হবার উপায় নেই।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের গ্লাসের সমস্ত তরল গলায় চালান করে উঠে দাঁড়ালেন।

—ভুল বলছো তোমরা। এই ঘটনায় সবাই উল্টে ভয় পাবে। ভাববে এ কীরকম শক্তিশালী কোম্পানি যে কিনা মহারাজ নন্দকুমারকে অবধি রেয়াত করে না।

কথাটা বলে বিচ্ছিরি হাসলেন হেস্টিংস। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে বসেছিলেন। তিনিও ভুগছেন সিদ্ধান্তহীনতায়। তিনি বলতে চাইলেন,

—কিন্তু...

গভর্নর জেনারেল হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন,

—কোনো কিন্তু নয়। বজ্জাত নন্দকুমার আমার বিরুদ্ধে কাউন্সিলে অভিযোগ করেছিল। আমার বিরুদ্ধে! ভারতের গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে! এরকম শিক্ষা দেবো যে পদস্থ অফিসার ভুলে যান ভারতের একটা কুকুরও আর কখনো কোম্পানির চাকরদের সামনে অব্দি ঘেউ ঘেউ করার সাহস পাবে না।

গভর্নরের চোখে আজ রক্ত নেমেছে। মাথায় ক্রোধাগ্নি লাভাসম বইছে। উপস্থিত সকলে বুঝলেন এই মুহূর্তে তাঁকে আর কিছু বলা উচিত হবে না। গভর্নর নিজেই বললেন,

—এতোদিন সুযোগ পাইনি। এবার কামালউদ্দিনের মাধ্যমে সুযোগ হেঁটে আমাদের কাছে এসেছে। সুযোগের সদব্যবহার অবশ্যই করব। যাও, মোহনপ্রসাদের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করো। তারপর যা হবে আমি সামলে নেব।

উপস্থিত কিছু বাঙালির গভর্নরের এই সিদ্ধান্তে যারপরনাই খুশি হলো।

ক্রোধের চোটে পরের গ্লাসটা ঢকঢক করে পান করলেন হেস্টিংস। তারপর গ্লাসটাকে জিঘাংসক হয়ে এত জোরে চেপে ধরলেন যে গ্লাস ভেঙে গেলো হাতের তালুর চাপে। টপটপ করে মাটিতে রক্ত পড়তে লাগলো। এসব ছোটখাটো বিষয়ে তাঁর মন নেই। সাহেব নন্দকুমারের অনিষ্টের খবর শুনতে উদগ্রীব হয়ে আছেন।

* * *

হলঘরে একটি সুদৃশ্য গদিতে বসে আছেন মহারাজ নন্দকুমার। একটার পর একটা ঝড় ঝাপ্টায় বাংলার রাজনীতি এক অস্থির

অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেই রাজনীতির ফলে দেওয়ানি গেছে। তবু হেরে যাবার পাত্র নন নন্দকুমার। ওয়ারেন হেস্টিংসকে শায়েস্তা করতে হবে। প্রয়োজনে কোম্পানির বিরুদ্ধে গিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। নন্দকুমারের শরীর এখনো এতটা অশক্ত নয় যে তিনি হেস্টিংসের কাছে হেরে যাবেন। সত্তর বছরে বয়সেও তিনি ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী।

এই তো কিছু সময় আগের কথা। আজ সন্ধে থেকে এই হলঘরেই বসেছিল এক গোপন বৈঠক। আশপাশের অঞ্চলের সমস্ত জমিদার এসে যোগ দিয়ে গেছেন এই বৈঠকে। সবার সঙ্গে শলাপরামর্শ চলছে কীভাবে ওয়ারেন হেস্টিংসকে জব্দ করা যায়। শুধু হেস্টিংস নয়, তার সঙ্গে তাঁর বেশ কিছু ইংরেজ ও ভারতীয় সাঙ্গোপাঙ্গ রয়েছে যারা বিভিন্ন অনৈতিক কাজে জড়য়ে পড়েছে। কোম্পানির চোখে ধুলো দিয়ে এরা ভারতবর্ষে জালিয়াতির পর জালিয়াতি করে চলেছে। নিজেদের পকেট ভারী করা ছাড়া ওদের আর কোনো লক্ষ্য নেই। যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো সময় বারবার ফিরে আসবে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে। ইংরেজদের যথা শীঘ্র বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

নন্দকুমার যখন এই সমস্ত কথা একা ঘরে বসে ভাবছেন ঠিক তখন তাঁর মহলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে কোম্পানির সিপাহিবাহিনী। তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। সেই পরোয়ানার উপর ভর করে একদল সিপাহি তাঁর মহলের বাইরে এসে দাঁড়াল।

--আপনার গ্রেপ্তারির পরোয়ানা বেরিয়েছে। আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।

মহারাজা নন্দকুমারকে পরোয়ানা দেখানো হল। তাতে বিচারক

এস. সি লমিস্টার এবং জন হাইডের স্বাক্ষর ছিল। নন্দকুমার সেটা দেখলেন।

পরবর্তী কিছু সময়ের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিবেশীদের অবাক করে তাঁর হাতে দড়ি পড়িয়ে তাকে তাঁর মহল থেকে টেনে বের করলো সিপাহিরা। চারদিকে শোরগোল পড়ে গেল। যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মহারাজা নন্দকুমারকে বর্ধমান, নদীয়া এবং হুগলির দেওয়ান বানিয়েছিল আর সেই কোম্পানির নির্দেশেই সিপাহিরা তাঁকে ধরে নিয়ে চলেছে।

এই দিনটা যে আসতে চলেছে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি নন্দকুমার। সাহেবরা ষড়যন্ত্র করছিলেন, নন্দকুমারও পাল্টা দিচ্ছিলেন। কিন্তু নন্দকুমারসহ তৎকালীন বহু মানুষ খেলাটা বুঝতে পারেননি। সেদিন যখন তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলো, তখন একবার হলেও তাঁর মনে এসেছিল—সিরাজের সঙ্গে বেইমানি করা উচিত হয়নি।

খবরটা দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার মানুষ ভাবতে পারেনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এতো শক্তিশালী যে মহারাজা নন্দকুমারের মতো প্রভাব প্রতিপত্তিশালী একজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে। সভাই নড়েচড়ে বসল। ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে আর বাকি রইল না। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো জনগণ। ওয়ারেন হেস্টিংস যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল।

শুধু মহারাজা নন্দকুমার গ্রেপ্তার হলেন না, গ্রেপ্তার হলো আগামী একশো বাহাত্তর বছরের স্বাধীনতা।

পা দু'টো ভারী লাগছিল। তবু টেনে টেনে এগোতে লাগলেন নন্দকুমার। লাঞ্ছনার চরম গণ্ডী যে পার হয়ে গেছে তা তিনি সততই বুঝতে পারছেন। তবে হাল ছাড়লে চলবে না।

জেলের কুঠুরিতে ঢুকে চারদিকে তাকালেন তিনি। তারপর গিয়ে বসলেন এক কোনায়। আশপাশে খুনি আসামি রয়েছে। প্রাক্তন দেওয়ান বলে আলাদা কোনো খাতির যত্নের বালাই নেই। চুপ করে বসে রইলেন নন্দকুমার।

চেনা পরিচিত লোক এল দেখা করতে। সকলেই বলে গেলো—শুধু এক রাতের ব্যপার। কাল সকালেই আপনাকে আমরা হইহই করে নিয়ে যাবো মহলে।

নন্দকুমার উত্তর দিলেন না। তিনি জানেন এই যুদ্ধ অনেক দূর অব্দি গড়াবে। নন্দকুমার চোখ বন্ধ করলেন। নিজেকে মানসিকভাবে আরও শক্ত করে তুলতে হবে। এই লড়াইয়ে তিনি এত সহজে হেরে যাবেন না।

ওদিকে থানার বাইরে মানুষ জড়ো হতে লাগলো। যত রাত বাড়লো তত বেশি লোক জমা হলো বাইরে। এই গ্রেপ্তারি বাংলার মানুষ মেনে নিতে পারলো না।

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর অফিসে একটি আরাম কেদারায় বিসে আছেন। তাঁর হাতে ব্যান্ডেজ। ওই হাতেই ধরা আছে কাচের গ্লাস। তাতে রঙিন তরল। দেওয়ালে ঝুলতে থাকা কোম্পানির প্রাক্তন দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

—চিয়ার্স নানকুমার। চিয়ার্স।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



কারাগারের বন্ধ কুঠিতে খুব একটা কিছু করার থাকে না। বেশিরভাগ সময় মহারাজ নন্দকুমারের কাটে স্মৃতি মন্থনে। বাইরে তাঁকে নিয়ে হুলস্থুল পড়ে গেলেও মহারাজকে তা স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি দিনের নির্দিষ্ট সময় কাটান যোগাসন ইত্যাদি করে। তারপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসা কয়েকশো লোককে তিনি দর্শন দেন।

প্রথমদিন যেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেদিন জেলের বাইরে লোকে লোকারণ্য অবস্থা। কোনো মতে সেটা আয়ত্তে আনতে পারলো কোম্পানির সিপাহিরা। কিন্তু প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে শর্তে সকলে ফিরে গেলো।

পরদিন এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী থাকলো গোটা কর্তৃপক্ষ। নন্দকুমারের থেকে সালিশি নিতে উপস্থিত একদল বাদি বিবাদী। মহারাজ বলে কথা! তার কথা ভিন্ন নবনির্মিত সুপ্রিম কোর্ট অব্দি তুচ্ছ তাদের কাছে। কর্তৃপক্ষ কারাগারের ভিতরেই ব্যবস্থা করে দিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের কাছে খবর গেল,

—আপনার জন্য কয়েকশো মানুষ অপেক্ষা করছে। ফরিয়াদি আছে, আসামি আছে। সবাই উপস্থিত।

মহারাজ শুকনো হাসলেন। তারপর বললেন,

—আসছি। আমাকে একটু সময় দিন।

সিপাহি চলে যেতেই উঠে বসলেন। নিজের ধুলোমাখা রাজপোশাক পরে নিলেন। মহারাজ মহারাজের বেশেই যাবেন সর্বসমক্ষে।

স্থান নির্দিষ্ট করা ছিল। যথাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন মহারাজ নন্দকুমার। সিপাহিরা পাহারায় মোতায়েন রইলেন। চারদিকে জয়ধ্বনি উঠল— মহারাজ নন্দকুমারের জয়। জয় মহারাজ নন্দকুমারের জয়।

সামনে রাখা কারাগারের একটু সাধারণ চেয়ারে বসার আগে মহারাজ হাত তুললেন। প্রজারা শান্ত হয়ে মাটিতেই বসে পড়লো। মহারাজ বসলেন চেয়ারে। জং ধরা চেয়ার সশব্দে জানান দিলো এ এক কারাগারের গল্প।

মহারাজ নন্দকুমার তাকালেন সামনে বসে থাকা গরিব গুর্বো, মধ্যবিত্তদের দিকে। সবাই হাত জোড় করে বসে আছে। মহারাজই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন,

—তোমাদের কী ফরিয়াদ?

বেশ কয়েকজন ফরিয়াদি উঠে নিজের নিজের সমস্যা জানালো। আসামিরাও উঠে দাঁড়ালেন। সব শুনে নন্দকুমার হাসলেন,

—তাহলে তোমাদের কারো হাঁস মুরগি চুরি গেছে, কেউবা সামান্য কিছু অর্থ ধার দিয়ে অর্থ ফেরত পাওনি। সেই ফরিয়াদ জানাতে আমার সঙ্গে কারাগারে সাক্ষাৎ করে সালিশি সভা বসাতে এসেছো। তাই তো?

বাদি বিবাদীরা একে অপরের দিকে তাকায়। নন্দকুমার শব্দ

করে হাসলেন। তারপর বললেন,

—আমি তোমাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বুঝি। তাই বলে এতো কষ্ট করে বাদি ফরিয়াদি হয়ে আসতে হবে না। আমাকে খুব বেশিদিন কোম্পানি আটকে রাখতে পারবে না। আমি নির্দোষ। আর যদি মিথ্যে ঘটনা সাহিয়ে দোষী প্রমাণ করেও দেয় তাতেও এর শাস্তি নামমাত্র। তোমরা ফিরে যাও। আমি শীঘ্রই ফিরবো।

একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে একজন বলে উঠে,

—মহারাজ, তবু আমাদের একটা কথা আপনাকে রাখতেই হবে।

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন,

—বলো কী কথা?

লোকটা বলল,

—আমরা রোজ আসব। আপনি মহলে থাকতে যেরকম দরবার করতেন এখানেও সেই ব্যবস্থা বহাল রাখুন। আমরা আপনার বিচারেই সন্তুষ্ট। কোম্পানির বিচারের প্রতি আমাদের ভয়।

মহারাজা নন্দকুমার এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন,

—বেশ তাই হবে। আমি সিপাহিদের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি।

সকলে মহারাজকে প্রণাম করে ফিরে চলে গেল। মহারাজ ফিরে এলেন নিজের লোহার খাঁচায়। এত অপরিচ্ছন্ন জায়গায় কখনো থাকেননি। আজকাল বয়সও হয়েছে। মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবার কথা। তবু ধীরে ধীরে নিজের মত করে একটু গুছিয়ে নিলেন। বাইরে তিনি যাই বলুন না কেন, তিনি তো জানেন এখানে বেশ কিছু দিনের জন্য আস্তানা হয়েছে।

এভাবেই দিন কাটতে থাকে। দিনের এক সময় যোগব্যায়ামাদি করেন তিনি। ঘণ্টা দুয়েক দরবার সভা বসে। তারপর বাকি সময় নিভৃতে কাটান নিজের নতুন বাসস্থানে। লোহার গারদকে খুশি মনে এভাবে নিজের বাসস্থান ক'জনেই বা বানাতে পেরেছেন। তবে তিনি জানেন তিনি মহলে থাকতেও জনসাধারণের মনে রাজার মতো রাজত্ব করতেন, এখনো তাই করছেন।

অবসর সময়ে স্মৃতিচারণা করতে থাকেন আপনমনে। ধীরে ধীরে তাঁর মনে পড়ে ছোটবেলার কথা, ভদ্রপুরের কথা। তৎকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার ভদ্রপুর গ্রামে জন্ম। তখন ১৭০৫ সাল। পরবর্তীকালে ভদ্রপুর বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন সেসবের বালাই ছিল না। পিতা পদ্মনাভ রায় অত্যন্ত পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। সারা দেশেই তাঁর পরিচিতি ছিল। নবাব আলীবর্দি খাঁ যখন বাংলা শাসক, তখন পদ্মনাভ রায় বাংলার তিনটি পরগণার রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি ছিলেন আলিবর্দি খাঁ-য়ের অত্যন্ত বিশ্বস্ত মানুষ।

নন্দকুমার ধীরে ধীরে অধ্যাপকের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করলেন। বর্তমানে যেরকম রাজভাষা হল ইংরেজি ভাষা তখন ছিল ফারসি ভাষার সময়। তাই রাজকার্য পরিচালনা করতে হলে ফারসি শিখতে হবে। সেই শিক্ষাও পূর্ণ করলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো। তাই তো মাত্র বাইশ বছর বয়সে নন্দকুমার মহিষাদল পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার পেয়েছিলেন। খুব চতুর এবং ক্ষমতাবান বংশের কেউ না হলে এতো অল্প বয়সে অতবড় একটা পরগণার রাজস্ব আদায়ের কাজে সেইসময় কাউকে নিযুক্ত করা হত না।

পরবর্তীকালে নন্দকুমার মির জাফরের বিশেষ প্রিয়জন হয়ে

উঠলেন। সেই সুবাদে সিরাজের পক্ষ নিলেন না। লক্ষ্য ছিল কোম্পানির সাহায্যে সিরাজকে গদিচ্যুত করে পরবর্তীতে কোম্পানিকে দেশছাড়া করা। সেই চাল যে কত বড় ভুল ছিল তা কিছুসময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়েছিল।

নন্দকুমার দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। এর কিছুদিন পর মির জাফরের বিশেষ অনুরোধে দিল্লির তৎকালীন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি দানে সম্মানিত করলেন। তারপর মির জাফর নিজেও তাঁকে মহারাজ সম্বোধন করতে শুরু করলেন। ফলে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলো মহারাজ নন্দকুমারের নাম।

ইতিমধ্যে মির জাফর তখন কুষ্ঠ-ব্যাধিতে ভুগছেন। বছরখানেক পর মির জাফরের ইন্তেকাল হলো। তাঁর পুত্র নাজিম উদ্দৌলা বাংলার নতুন নবাব হলেন। নন্দকুমার আশা করেছিলেন যে তাঁকেই আবার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হবে। নতুন নবাবেরও তাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাধ সাধলেন রবার্ট ক্লাইভ।

মহারাজ নন্দকুমারের মনে পড়লো সেইসব দিনের কথা। পলাশির যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিছুকাল অতিক্রম করেছে। মির জাফর নামে মাত্রই নবাব। বাংলার প্রকৃত নবাব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

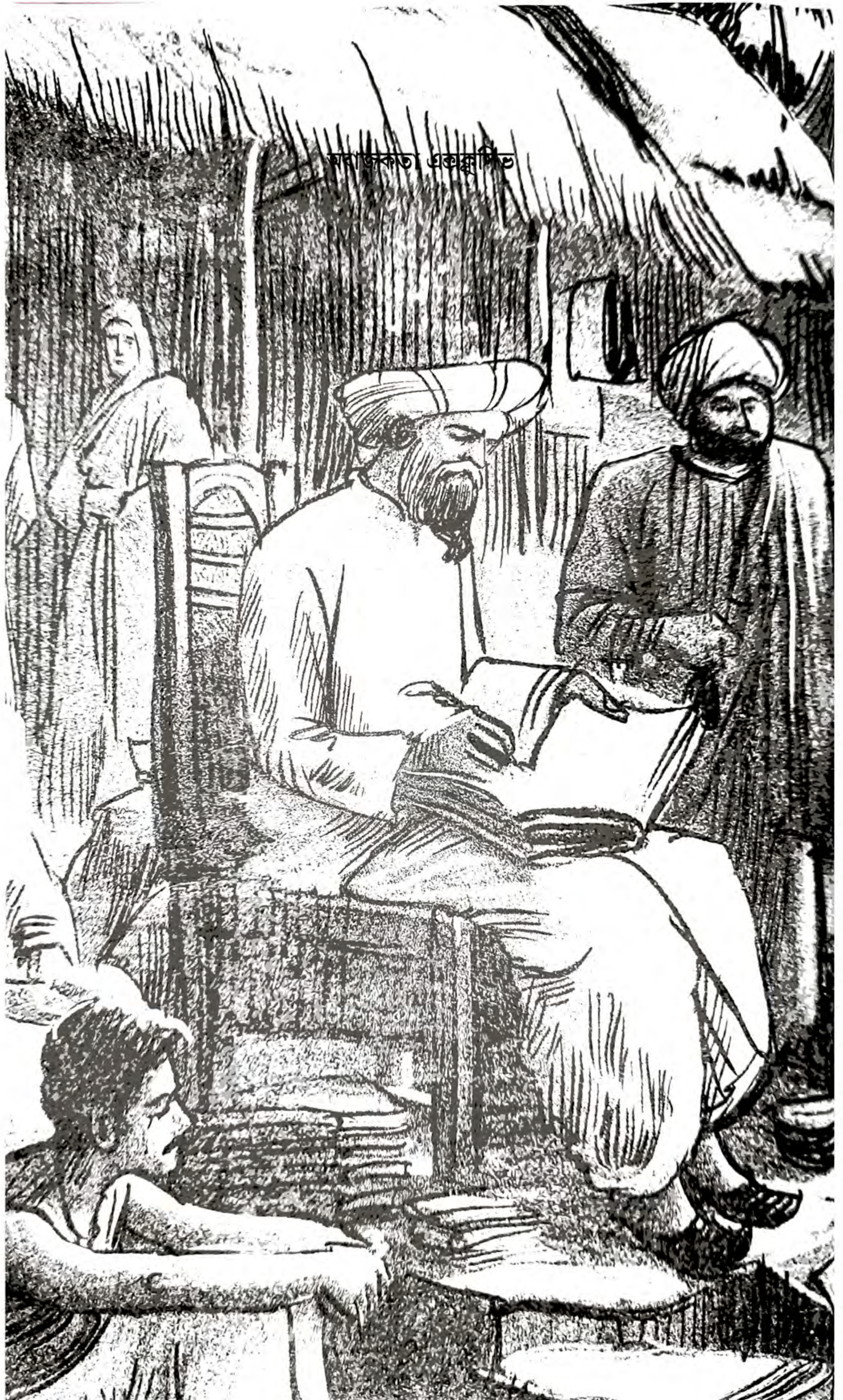
কোম্পানি বাংলাদেশে অবাধ বাণিজ্য করছিল। মির জাফরের সঙ্গে ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির চুক্তি অনুযায়ী বাণিজ্যের ব্যাপারে তিনি একেবারেই হস্তক্ষেপ করবেন না। মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি শহরে কোম্পানির বিশাল বড় বড় কুঠি স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে কোম্পানির অধীনস্থরা দেশ চালাচ্ছে। তাদের অধীনে আবার বহু দেশীয় গোমস্তা কাজ করে।

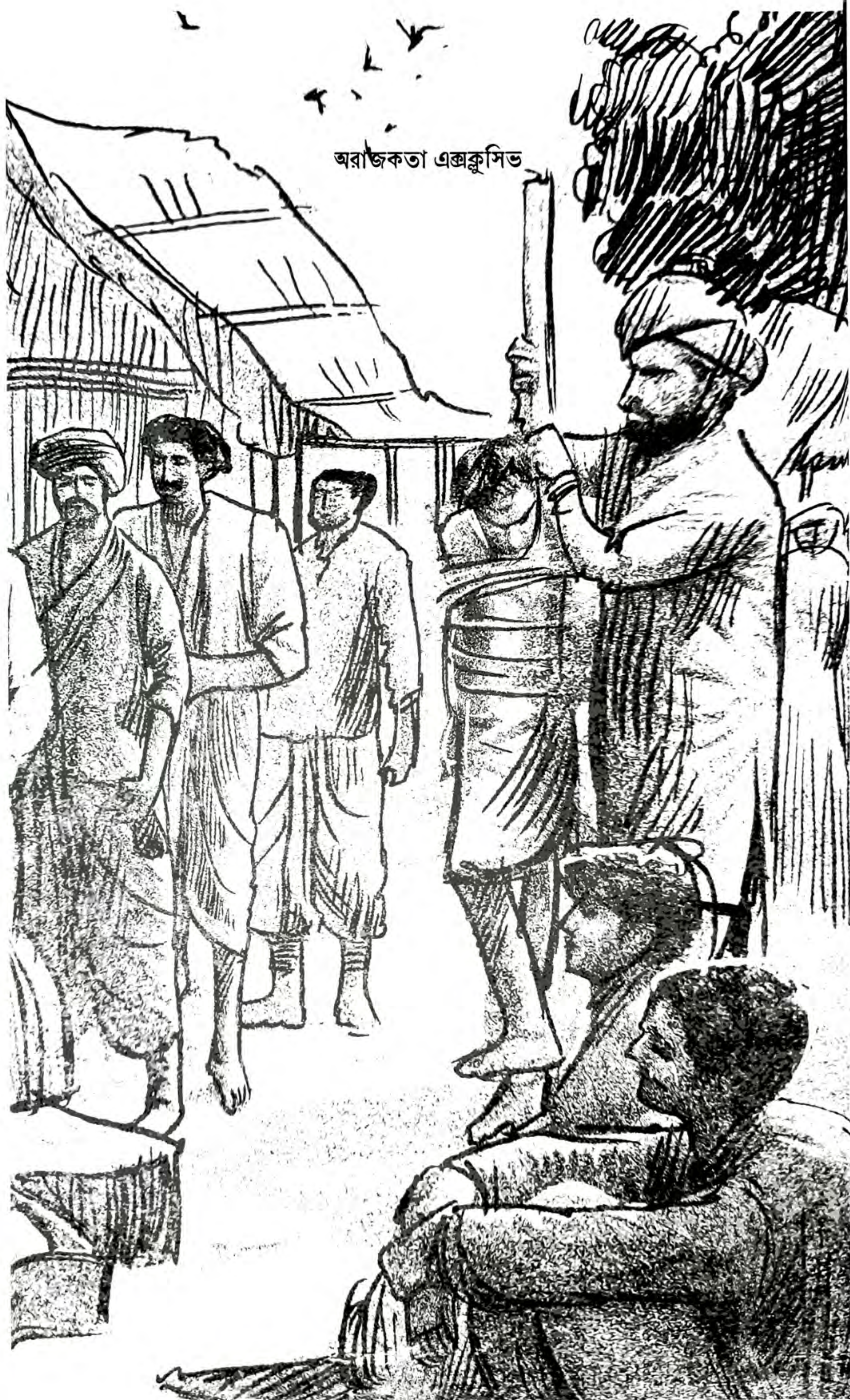
এই সব গোমস্তারা এবার মাঠে নামলো। অর্থলিপ্সু কর্মচারীদের

তুষ্ট করে প্রভূত অর্থোপার্জনের লোভে নিরীহ তন্তুবায় শিল্পীদের উপর শুরু করলো জুলুম। অবস্থা এরকম হয়ে দাঁড়ালো যে দেশের বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদারেরা এইসব গোমস্তাদের ভয় পেতে শুরু করে দিলো। নবাব ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইলেন। বরং তিনি ভয়ে থাকতেন কারণ গোমস্তাদের পিছনে কোম্পানির বিপুল শক্তি নিয়োজিত ছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে নবাব অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল তিনি এর প্রতিবাদ করা মানেই ভুক্তি ভঙ্গ হওয়া। আর যে কোম্পানি তাঁকে সিংহাসনে বসাতে পারে সেই কোম্পানি যে তাকে উৎখাতও করতে পারে তা তিনি ভালোই জানতেন। যদিও পরবর্তীতে এই ভয় তার কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। ক্লাইভের দ্বি-শাসন নীতিতে সারা দেশে একটা অনাচারের রাজত্ব কায়েম হলো।

পেয়াদা, হরকরা প্রভৃতি নিয়ে এক একজন গোমস্তা এক এক জায়গায় জায়গায় কাছারি বসিয়ে দিত। এরপর হরকরা পাঠিয়ে পল্লিগ্রাম থেকে তন্তুবায়দের ডেকে আনতো। ভয়ে সেইসব তন্তুবায়দের আসতে হত। তাঁদের অধিকাংশই সম্পন্ন অবস্থার ছিলেন। তবু গোমস্তাদের ভয় এরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল যে সেই ডাকে সাড়া না দেবার মতো সাহস তাঁদের ছিল না।

গোমস্তা তন্তুবায়দের কাপড় কেনার জন্য অগ্রিম অর্থ দিতো এবং এই মর্মে একটি দলিলে সইসাবুদ করিয়ে নিত যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র গোমস্তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এবার এই সময়ে এই পরিমাণ কাপড় কখনো উৎপাদন সম্ভব হত না। তবু সব বুঝেও অর্থ নিতে হত। হয় স্বেচ্ছায় নিতে হতো নয়তো বেত্রাঘাত খেয়ে নিতে হতো। কিন্তু নিতে তাদের হতই।





অরাজকতা এক্সক্লুসিভ

২৬ ব্রহ্মহত্যা

তাঁতীরা যাতে স্থানীয় বাজারে বা ফরাসি ওলন্দাজদের কাছে কাপড় বিক্রয় করতে না পারে সেজন্য তাদের উপর কড়া নজরদারি করা হতো। যাদের উপর এই নজরদারির দায়িত্ব থাকত তাদের পাহারার শিথিলতার কারণে যদি তাঁতিরা অন্য কোথাও কাপড় বিক্রির সুবিধা পেয়ে যেত তাহলে তাঁতিদের সঙ্গে সেই পাহারাদারদেরও শাস্তি হতো।

বাজারে যে দামে কাপড় বিক্রি হতো বা বিদেশি সওদাগর যে দাম দিতে চাইতো তার বদলে কোম্পানির গোমস্তারা কখনো কখনো তা থেকে শতকরা ত্রিশ বা চল্লিশ টাকাও কম দিতো। কিন্তু তবু এই গোমস্তাদের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় বিক্রির উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়। এতো সবের পরেও যদি অন্য কোথাও বিক্রি করে দেয় এই সন্দেহে তাঁতে যতটুকু কাপড় বোনা থাকতো তাঁত থেকে ততটুকু কাপড় কেটে নিয়ে যেত। দাদন দেওয়ার সময় কোনো নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে এত বেশি বস্ত্র তৈরির ফরমায়েশ দেওয়া হত যে তার দশগুণ বেশি সময় দিলেও ওই পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাণিজ্যে সুযোগ না দেওয়া এবং একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষা করাই হলো এই ব্যবস্থার কারণ।

এবার তাঁতি যদি যথাসময়ে কাপড় দিতে না পারে তাহলে কী হবে? ক্ষতিপূরণের অজুহাতে তার সমস্ত ঘরবাড়ি গোমস্তার দখলে চলে যাবে। অবস্থাপন্ন তাঁতিরা একে একে এভাবেই অর্থহীন, গৃহহীন হয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পথে বসতো। শুধু যে ঘরবাড়ি লুঠ করে, তাঁতিকে চাবুক মেরে, চোর-ডাকাতের মতো হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তি হতো এমন নয়। তাঁতিদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীনা স্ত্রীলোকদের প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতো। নষ্ট করা হতো সতীত্ব।

মূলত কাশিমবাজার অঞ্চলেই এই অত্যাচার শুরু হয় এবং মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তৎকালীন কাশিমবাজার ঠিক ততটাই গৌরব ও সমৃদ্ধিপূর্ণ এক বাজার অঞ্চল। সারাদিন লোকারণ্যে পরিপূর্ণ এই বাংলার প্রধাম বাণিজ্যস্থান বলে পরিগণিত, ভাগীরথী, গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীত্রয় পরিবেষ্টিত তৎসাময়িক কাশিমবাজারের প্রকৃত গৌরব বড় বড় ঐতিহাসিক শহরকে লজ্জায় ফেলে দেয়। নানা দেশ থেকে অসংখ্য বণিক বাণিজ্য করতে আসছে। ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, আরমানিয়ান বণিকদের সৌধ অট্টালিকা, ভাগীরথীর বুকে ভাসমান অসংখ্য অর্ণবপোত, স্থানে স্থানে রাশিকৃত পণ্যসামগ্রী, নদীর পাশে মালের গুদাম, প্রচুর রেশমকুঠি, দেশীয় তাঁতিদের সারি সারি দোকান, দোকানের সামনে দোলায়মান নানারকম রেশমী বস্ত্র, সবসময় কাশিমবাজারকে এক অপূর্ব শোভায় পরিপূর্ণ করে রাখতো।

আর এই বাজারের মাঝেই গোমস্তারা বসাতো কাছারি। এখানেই হতো চুক্তিপত্র স্বাক্ষর। আর এখানেই হত বিচার সভা।

কাশিমবাজারের তাঁতিদের ঘরে ঘরে কান পাতলে তখন কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতো। সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কাশিমবাজারে রেশমের কুঠির কর্মচারী এবং গোমস্তাদের ব্যবহারে ১৭৬৬ সালে আশপাশের গ্রাম থেকে এক রাতে সাতশো তাঁতি তাদের বাসভূমি ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঘটনা এক প্রবাদে পরিণত হয়েছিল পরবর্তীকালে।

কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ উপার্জন। একচেটিয়া অধিকারের বলে সেটা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। হতভাগ্য বাঙালিও দলে দলে কোম্পানির কাজে যোগ দিতে লাগল। কোম্পানির মন জুগিয়ে না চললে কোপানলে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ঠিক এরকমই এক সময়ে শুরু হলো আরেক ব্যবসা। কোম্পানি বাংলাদেশের নানা জায়গায় লবণের গোলা স্থাপন করল। লবণের বাণিজ্যেও কোম্পানির একাধিপত্য রইল। তন্তুবায় শিল্পীদের মতো এখানেও একই ফন্দির ব্যবহার হলো। দেশীয় লোকের তৈরি করা সমস্ত লবণ কোম্পানি কিনে নিত। অন্য কারো কাছে সেই লবণ বিক্রি করা যেত না। এবার যে লবণ বারো আনা মণ হিসেবে কেনা হত, সেই একই লবণ দেশীয় লোকেদের কোম্পানির কাছে থেকে কিনতে হত পাঁচ টাকা মণ হিসেবে। এহেন লোক নেই যারা লবণের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করেনি। আর এক অংশ এই লবণের ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলো।

লবণের বাণিজ্য এতোই প্রবল আকার ধারণ করে যে ইংল্যান্ডে কোম্পানির ডিরেক্টররা অবধি এই খবর পৌঁছয়। তারা তৎক্ষণাৎ এই ব্যবসা নীতি বন্ধ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু ক্লাইভের নের্তৃত্বে কোম্পানির কর্মচারীরা ভ্রুক্ষেপ অব্দি করলো না। টানা দুই বছর ধরে ইংল্যান্ড থেকে চিঠিচাপাটি হতে থাকলো। দুই বছরেও তাঁদের আদেশ গ্রাহ্য হল না দেখে তারা লবণের মণ মাত্র দুই টাকা করে বিক্রি করার শেষ আদেশ দিলো। ক্লাইভ দেখল এতদিনে যা ব্যবসা করার হয়ে গেছে। তারপর বারো আনা দামের লবণ পাঁচ টাকা থেকে দুই টাকায় নেমে এল।

শুধু তাঁত আর লবণ নয়, কোম্পানি একই পদ্ধতিতে তামাক-সুপারি ইত্যাদির ব্যবসা অব্দি শুরু করেছিল। ক্লাইভ বুঝিতে পেরেছিলেন এবার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। একটা সরকারি সিলমোহর প্রয়োজন। ক্লাইভ ও তাঁর কাউন্সিল মেম্বাররা কলিকাতায় একটা বণিক সভা স্থাপন করলেন। কোম্পানির অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারী এই সভার সভ্য হয়েছিল।

নিয়ম এরকম ছিল, যত লবণ, তামাক, সুপারি এই দেশে উৎপন্ন হবে তা দেশীয় বণিকদের বণিক সভার নিকট একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

ভারতবর্ষে যেসব ইংরেজ আসতো তাদের বেশিরভাগই ভদ্রলোক ছিল না। ভদ্র শিক্ষিত ইংরেজরা ভাবতো ভারতে এলে কলেরা, প্লীহা-যকৃতের সমস্যা ইত্যাদিতে রোগে মরতে হবে। কারণ তারা ভাবতো ভারতের জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ। যারা আসত তারা অধিকাংশই একেবারে শাসনহীন, নৈতিক চরিত্রহীন। এই ইংরেজ যুবকগুলোর দৃষ্টি শুধু যে লুঠতরাজে ছিল তা না। ভারতীয় স্ত্রীদের প্রতি তাদের ছিল কামালুপ দৃষ্টি। খুব কম সংখ্যক ইংরেজ রমণী ভারতে আসতেন। ফলে এই উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী যুবকের দল বিয়ে না করে দেশীয় গোমস্তা প্রভৃতির সাহায্যে ছলে বলে কৌশলে বঙ্গরমণীদের সর্বনাশ করতো।

ক্লাইভ বুদ্ধি করে দেওয়ানির জন্য মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা মঞ্জুর করিয়েছিলেন। এই কাজে তাঁর বিশ্বস্ত ছিলেন মহম্মদ রেজা খাঁ। সঙ্গে সুগ্রীব দোসর ছিলেন সিতাব রায়। মহারাজ নন্দকুমার মির জাফরের মৃত্যুর পর কোম্পানি তথা ক্লাইভের খুব একটা কাছের লোক ছিলেন না। তাই নতুন নবাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর মহারাজা নন্দকুমারের বদলে রেজা খাঁ-কেই দায়িত্ব দিলেন ক্লাইভ। নবাবের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না।

মহম্মদ রেজা খাঁ দেওয়ান হবার পর থেকে যথেচ্ছাচার শুরু করলো। নবাবের থেকে বেশি নবাবি দেখা গেলো তার চালচলনে। কিছু সময়ের মধ্যেই তিনি বিপুল ধনরাশির মালিক

হয়ে উঠলেন। তার আমলে গোমস্তাদের দাপট বেড়েছিল। কোম্পানির একেবারে কাছের লোক হয়ে দেশীয় লোকেদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন।

মহারাজের মনে পড়ছে যে তিনি রেজা খাঁ-র অমানুষিক বর্বরতার কথা কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে একজন এজেন্ট নিযুক্ত করলেন। তারা কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে রেজা খাঁ-র কুকীর্তি ফাঁস করেছিল। কিন্তু কোনো হুকুম বলবৎ করার আগেই রেজা খাঁ-র বিচার হয়ে গিয়েছিল। ইহজগতে থাকতে থাকতেই পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের সঙ্গে তাই ঘটেছিল।

মহম্মদ রেজা খাঁ-র আমলে বাংলার কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল এই বাংলায়। টানা তিন চার বছর ধরে অনাবৃষ্টি। প্রজাদের ঘর আনাজশূন্য হয়ে গেলো। বৃদ্ধদের কথা বাদই থাকলো, বাচ্চাদের খাবার মত অন্ন রইলো না ঘরে।

হ্যারি ভার্লাস্ট তখন বাংলার গভর্নর পদে রয়েছেন। তিনি শুরু থেকেই ধান আর চালের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। দেশে যতই অন্নাভাব থাকুক, তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না। রাজস্ব যেমন ঠিকঠাক আদায় করা চাই ঠিক তেমনি তার গোলাগুলো ধানে পরিপূর্ণ থাকা চাই। দুর্ভিক্ষ বেশি হলে চাল আরও অধিক দামে বিক্রি করা যাবে এই ছিল তাঁর মতলব। তাতে কোম্পানির বহু টাকা লাভ হবে।

ফলে চালের দাম গেল বেড়ে। এদিকে নায়েব গোমস্তাদের জুলুম চলছে। রাজস্ব আদায় করা চাই। কোম্পানির হুকুম। অসহায় কৃষক ধানের বীজ অব্দি বিক্রি করে কর দিতে বাধ্য হলো।

কিন্তু ১৯৬৯ সালে ফলন একেবারেই হল না। বাংলার কৃষিজমি মহাশ্মশানে পরিণত হল।

কোম্পানির আদেশ মোতাবেক মোহম্মদ রেজা খাঁ দমলেন না। তিনি মৃত লাশের উপর দিয়ে হেঁটে হলেও গোমস্তাদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন। প্রকাণ্ড প্রাসাদে বসে সুন্দরী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা রেজা খাঁয়ের কানে বাংলার মানুষের হাহাকার পৌঁছালো না।

প্রজারা উচ্ছন্নে গেলেও কোম্পানি তার সিপাহিদের জন্য যথেষ্ট চালের মজুত আগে থেকেই রেখেছিল। সিপাহি অভুক্ত থাকলে রাজত্ব সামলাবে কে?

এবার অনেকের মনে হলো কলিকাতায় গেলে হয়তো অন্ন সংস্থান হবে। ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করতে করতে উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, পূর্নিয়া ইত্যাদি জায়গা থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে জীর্ণ কঙ্কালসার মানুষ একমুঠো অন্নের জন্য কলিকাতা রওনা দিলো। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! যেন কঙ্কালের দল ছুটছে। এতো বছর পর ভাবলেও নন্দকুমারের চোখে জল আসে। কী জানি, সেই সময় ক্ষমতায় থাকলে হয়তো এর কিছুটা প্রতিকার তিনি করতে পারতেন।

এই কঙ্কালযাত্রায় সবাই কলিকাতায় পৌঁছাতে পারলো না। অর্ধেকের পথেই জীবনাবসান ঘটেছিল। বাকি যারা পৌঁছাতে পারলো তারা কলিকাতা এসেও বিশেষ কিছু করতে পারলো না। চালের অভাব সর্বত্র। পথেঘাটে রাস্তার ধারে অন্তিমশয্যায় শুয়ে রইলো সবাই। এই দৃশ্য যে কী ভয়ানক তা যে দেখেছে সে জানে।

কিন্তু রেজা খাঁ-র মন গললো না। তিনি ততদিনে পাষাণে পরিণত হয়েছেন। উল্টে তিমি অধিক লাভ করার কথা ভেবে

নিজের গোলায় তিন লক্ষ মণ চাল অল্প দামে কিনে রেখে দিয়েছিলেন। ততদিনে চালের দাম দশ গুণ বেড়ে গেছে। তিনি ভাবলেন দাম আরও বাড়লে আরও বেশি দামে তা বিক্রি করে দেওয়া যাবে।

ঠিক এইসব কথা যখন নন্দকুমার ভাবছেন তখন তিনি হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। তাঁর এক গুরুদেব ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর আশীর্বাদেই আজ যা কিছু তিনি হতে পেরেছেন। গুরুদেবের যুক্তি পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ তিনি করতেন না। পরবর্তীকালে সেই যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু শ্রদ্ধা কমেনি। গুরুদেব সাধারণ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। ইতিহাসে তাঁর উল্লেখ অত্যন্ত কম থাকলেও নবাব আলিবর্দি খাঁ থেকে শুরু করে বাংলার পরবর্তী নবাব সকলেই সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণকে খুব মেনে চলতেন ও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

মোহম্মদ রেজা খাঁ যখন চাল নিজের গুদামে আটকে রেখেছিলেন তখন এই গুরুদেব এসেই এর প্রতিকার করেন। রেজা খাঁ আদতে ভীতু লোক ছিলেন। কোম্পানিকে সমীহ করে চলতেন। আর এই গুরুদেবকে যে উপরমহল বেশ তোয়াক্কা করে চলে তা তিনি জানতেন। তাই গুরুদেব এসে যখন রেজা খাঁ-কে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন রেজা খাঁ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পঞ্চাশ হাজার মণ চাল কলিকাতার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার কোম্পানির কর্মচারীরা যে কাজটা করলো সেটা ভাবলেও আজকেও নন্দকুমারের মাথায় আগুন জ্বলে উঠে। নিজেরা দুর্ভিক্ষের আন্দাজ করে চাল মজুত করে রেখেছিলো। সেগুলো চড়া দামে বিক্রি করছিলো। উপরন্তু রেজা খাঁ-র পাঠানো

চাল দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকায় পৌঁছবার আগেই তারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিলো। তারপর সেই চাল চড়া মূল্যে বিক্রি করতেও তারা পিছপা হল না। হিসাব চাইলে সম্পূর্ণ জাল হিসাব কাউন্সিলে পাঠিয়েছিল তারা।

কোম্পানির ডিরেক্টরদের এই খবর নন্দকুমারসহ আরও অনেকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁরা কৈফিয়ত তলব করেছিল। কোম্পানির কাউন্সিলেও ছিল এইসব বজ্জাত ইংরেজদেরই বন্ধুবান্ধব। তারা এই দোষ গোমস্তাদের উপর চাপানোর চেষ্টা করে। যদিও তাতে ভবি ভোলেনি। ডিরেক্টররা দোষীদের নাম জানতে চাইলেন। সেই নাম কাউন্সিল আর কখনোই তাদের হাতে তুলে দিল না। তারপর যা হয়, ঘটনা চাপা পড়ে গেল।

এইই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেলো। কৃষিপ্রধান বাংলার কৃষককুল ধ্বংস হয়ে গেলো। বাংলার মেরুদণ্ড ভাঙলো। যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁরাও প্রায় মৃতবৎ পড়ে রইলেন।

দুর্ভিক্ষের পর কর আদায় প্রায় বন্ধ হবার জোগাড় হলো। কোম্পানির অবস্থা শোচনীয় হলো। এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে কর্নেল বারগঁয় এবং মিঃ ঠান্ডারসের নেতৃত্বে কমিটি নিযুক্ত হলো। ক্লাইভ, হ্যারি ভার্লাস্ট-সহ সমস্ত কু-চক্রীদের দুর্নীতির বৃত্তান্ত ইংল্যান্ড অবধি ছড়িয়ে পড়লো। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা এবং বিপুল অর্থ সমাগমের উপায় বের করার পরেও ক্লাইভের কপালে জুটলো ভর্ৎসনা। পরবর্তীকালে এই গঞ্জনা নিতে সইতে পারেননি। আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

ঠিক এরকমই এক সময়ে ভারতের রাজনীতিতে ওয়ারেন

হেস্টিংসের আবির্ভাব হয়। শুরুতে মোহম্মদ রেজা খাঁ-র সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেও তিনি রেজা খাঁ-কে পদচ্যুত করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। রেজা খাঁ-র নবাবি জীবনযাত্রাই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন গভীর রাতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডলটন সাহেব বিহু সিপাহিসহ রেজা খাঁ-র প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। রেজা খাঁ তখন নিশ্চিন্তে আকণ্ঠ পান করে নিদ্রা গেছেন। সাহেবের বাঁশির শব্দে এবং সিপাহিদের কোলাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই চারদিকে জেগে উঠলো। লাফিয়ে উঠলেন দেওয়ান রেজা খাঁ। মিডলটন সাহেবের পায়ে ধরার উপক্রম হলো কিন্তু তাতেও সাহেবের মন গললো না। রেজা খাঁ বললেন,

—আপনার কী চাই বলুন সাহেব? আমি আমার সব আপনাকে দিয়ে দেবো।

মিডলটন হেসে বললেন,

—তোমার এই সম্পত্তির চেয়ে বেশি কিছু আদায় করতে আমি ভারতে এসেছি। এখন কান্নাকাটি বন্ধ করো এবং আমাদের সঙ্গে চলো।

মিডলটনের কাছে হেস্টিংসের বাহবা ছাড়া অন্য কিছুর কোনো মূল্য নেই। রেজা খাঁ-র অধ্যায় শেষ হলো। তাঁকে বন্দি করে কলিকাতা পাঠানো হলো।

একই সময়ে রাজা সিতাব রায় পাটনার দেওয়ান নিযুক্ত ছিলেন। কোম্পানির অনুগত হলেও দুর্ভিক্ষের সময়ে তহবিল তছরুপের বেশ কিছু অভিযোগ জমা ছিল সিতাব রায়ের নামে। তাঁকেও বন্দি করা হলো এবং কলিকাতায় পাঠানো হলো। হেস্টিংস কাউকে না জানিয়েই এই কাজ করেছিলেন। কলিকাতা

কাউন্সিলের কেউ ঘুণাক্ষরেও এই গ্রেপ্তারির ব্যপারে কিছু জানতেন না। তাঁদের বন্দি করে কলিকাতা পাঠানোর পর সংবাদ রটে গেলো। সবাই জানতে পারলো।

হেস্টিংস খুব দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তিনি কেউ একটা কাজে দুটো সমস্যার সমাধান বের করলেন। এবার থেকে দেওয়ানি পদ তুলে দিয়ে তিনি নিজে রাজস্ব আদায় করবেন। দেওয়ান-সুবাদার পদ লোপ পাবে। দ্বিতীয়ত দেশীয় লোকেদের শাসন সংক্রান্ত কাজ হতে দূরে রাখা হবে।

কিন্তু এবার হেস্টিংস পড়লেন সমস্যায়। রেজা খাঁ-কে গ্রেপ্তার তো করা হলো। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ কই? একই কথা সিতাব রায়ের ক্ষেত্রেও খাটছে। হেস্টিংস এবার একটু খোঁজ নিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে রেজা খাঁ-র বিরোধ সর্বজনবিদিত ছিল। রাজা সিতাব রায়ও যে নন্দকুমারের বিশেষ প্রিয়জন ছিলেন না তা তিনি জানতে পারলেন। দিল্লির মুঘল বাদশাহ নন্দকুমারকে সম্মানিত করার জন্য সেকালের প্রথা অনুযায়ী একটি বহুমূল্য পালকি ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য পাঠিয়েছিলেন। জিনিসগুলো নন্দকুমারের কাছে পৌঁছালে রেজা খাঁ অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে সিতাব রায় সেটা পাটনায় আটক করেন। এর থেকেই মনোমালিন্যের সূত্রপাত।

হেস্টিংস আবার দাবার চাল চাললেন। মহারাজ নন্দকুমারকে ডেকে বললেন,

—রেজা খাঁ আর সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ খুঁজে দিন। আপনার দেওয়ানি আপনাকে ফেওরত দেওয়া হবে।

মহারাজ নন্দকুমার আর ভাবতে পারেন না। এই একটা জায়গায় তিনি ভুল করে ফেলেছিলেন। হেস্টিংস যে বিশ্বাসযোগ্য

নন তা তিনি শুরুতে বুঝতে পারেননি। তাঁর মনেও দেওয়ানি হারাবার দুঃখ ছিল। তাই দেওয়ানির লোভে হেস্টিংস-কে সাহায্য করতে রাজি হলেন তিনি।

হেস্টিংস খুশি হয়ে নন্দকুমারকে বললেন,

—আপনি যদি এই কাজ করতে পারেন বাংলার ইতিহাস আপনাকে মনে রাখবে। সে ব্যবস্থা আমি করবো।

সত্যি সেই ব্যবস্থা তিনি পরবর্তীকালে করেছিলেন। তবে বাংলার মানুষকে নন্দকুমারের নাম মনে করানোর পন্থাটি ছিল বীভৎস।

নবকুমার শুরুর দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ শুরু করলেন। কিন্তু তারপর এরকম কিছু ঘটনা ঘটলো যাতে তাঁর কাজ করার ইচ্ছাটিই বিনষ্ট হয়ে গেলো। নিজের দেওয়ানীর লোভ ছেড়ে নন্দকুমার এরপর হেস্টিংস, রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে লাগলেন।

আশ্চর্যের বিষয় দুই বছরের মাথায় রেজা খাঁ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। সিতাব রায় সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হল। হেস্টিংস দেওয়ানি- সুবাদারের পদ তুলে দিলেন। রেজা খাঁ-কে আর কোনো পদ দেওয়া হলো না ঠিকই, তবে সিতাব রায়কে আবার কোম্পানির জন্য কাজ করতে বলা হলো। তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। অপরাধীর মতো গ্রেপ্তার করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। এই ঘটনা তাঁকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। অল্পদিনের মিধ্যেই তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

নন্দকুমার এবার ধীরে ধীরে নিজের মোহমায়া ত্যাগ করতে শুরু করলেন। এই প্রথম দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত

করতে চাইলেন। হেস্টিংসসহ সমগ্র কোম্পানির প্রতি তাঁর এক তীব্র বিতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছিল। রেজা খাঁ আর সিতাব রায়ের ঠিকুজি কুষ্ঠি বের করতে গিয়ে হেস্টিংসের সমস্ত অপকর্মের দলিল তাঁর হাতে এসে পড়েছিলো। নন্দকুমার এবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। হেস্টিংসকে দেশছাড়া না করে তাঁর শান্তি নেই।

এদিকে হেস্টিংসও জানেন যে নন্দকুমার তাঁর সমস্ত অন্যায় কর্মের হদিশ জেনে গেছেন। নন্দকুমারকে শান্ত করার জন্য তাঁর রাজা গুরুদাসকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বেতনে নবাবের গৃহকার্যে দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। এ এক বড় রাজনৈতিক চাল ছিল। তাতে সাময়িক লাভবানও হয়েছিলেন হেস্টিংস। তবে নন্দকুমার ততদিনে সমস্ত কিছু বুঝে গেছেন। তিনি শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন।

—আপনার খাবার এসে গেছে।

সিপাহির ডাকে সম্বিৎ ফিরলো নন্দকুমারের। তিনি খাবারের দিকে না তাকিয়েই বললেন,

—আমি তো এই জায়গায় খাবো না। আমার জন্য আলাদা খাবারের জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি যার তার হাতে খেতেও পারবো না। আমি ব্রাহ্মণ। ধর্ম নষ্ট করতে পারবো না। ব্রাহ্মণের ব্যবস্থা করুন।

সিপাহি আর কথা বাড়ায় না। খাবার যথাস্থানে রেখে ফিরে আসে। নন্দকুমারের মুখে এক প্রশান্তির ছায়া বিরাজ করছে। তিনি আর ভয় পাচ্ছেন না।



নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে হেস্টিংসের আনন্দের কোনো সীমা নেই। সে জানে এই দেশে একমাত্র নন্দকুমারই এরকম এক ব্যক্তি যার জন্য হেস্টিংসের সুখের রাজনীতিতে দাবানল জ্বলে যেতে পারে। একা একা আজ নিজের অফিস রুমে বসে মদ্যপান করছিলেন তিনি।

এই রাজত্ব তৈরি করতে বহু পরিশ্রম হয়েছিল। নন্দকুমারের মতো দেশীয় রাজার জন্য সব তছনছ হতে বসেছিল। ছোটবেলা থেকে কী পরিশ্রমই না করেছেন তিনি। পড়াশোনায় ভালো ছিলেন না। তাই কোম্পানির সামান্য কেরানি হয়ে ভারতে এসেছিলেন। তখন ১৭৫০ সাল। পড়াশোনা কম জানলেও তাঁর বুদ্ধি ছিল প্রখর। দুই বছর কেরানির কাজ করার পর তাঁকে কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরিতে বদলি করা হয়। কাশিমবাজার তখন দেশের এক বিশাল বাণিজ্যক্ষেত্র। কাশিমবাজার থেকে মাত্র দুই মাইলের মধ্যেই তখনকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ।

সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। অন্যদের মতো হেস্টিংসকেও বন্দি করে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হল। কলিকাতার ইংরেজরা সকলেই পরাজিত ও বন্দি হলেন। ওলন্দাজ

বণিকদের সঙ্গে হেস্টিংসের একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। তাদের অনুরোধে নবাব হেস্টিংসের উপর কোনো জুলুম করলেন না। বরং তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সেই রাগ যুবক হেস্টিংস মনে মনে পুষে রাখলেন। সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র শুরু হলো, হেস্টিংস তাতে যোগ দিলেন। সিরাজের উপর প্রতিশোধ নিতে ক্লাইভ ও ওয়াটসন সৈন্যসহ মাদ্রাজ থেকে বাংলাদেশ এসেছিলেন। এই সময়েই হেস্টিংস অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তারপর পলাশির যুদ্ধে সিরাজের হেরে যাওয়া, মির জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, মির জাফরের নবাব হওয়া এসব ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে। এই সময়টায় অন্য সকলের মতো হেস্টিংসও প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন। সেই সব ধনরাশি নিয়ে ১৯৬৪ সালে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে দুই হাতে অর্থ খরচ করলেন। চার বছরের মাথায় প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থা হয়ে গেলো। তাতে কিছুমাত্র হতাশ হলেন না তিনি। কারণ তিনি জানেন ভারতবর্ষে যাওয়া মাত্র আবার অর্থ সমাগম হতে থাকবে। কোম্পানির মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদস্য হয়ে তিনি আবার ভারত যাত্রা শুরু করলেন। সেই সময় জাহাজপথে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসতে তিন-চার মাস সময় লাগতো।

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা স্ত্রী ম্যারি বুচানান কিছু বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। কাজেই তিনি ছিলেন কার্যত একা। অথচ রমণীদের প্রতি তাঁর আসক্তির প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

জাহাজে তাঁর পরিচয় হয় ইমহফ নামে এক বিখ্যাত চিত্রকরের সঙ্গে। জার্মানিতে তার যথেষ্ট নামডাক ছিল। কিন্তু অর্থাভাবে

পড়ে তিনি ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন। ভারতে গেলে বিদেশিদের অর্থাভাব দূর হয় সেটা তিনিও নানতে পেরেছিলেন। সেই জাহাজে তার স্ত্রী ম্যারিয়ান ইমহফও উপস্থিত ছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের তিনজনের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। বন্ধুপত্নীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের খুব বেশি সময় লাগতো না। এ নিয়ে লর্ড ক্লাইভের বিখ্যাত উক্তি রয়েছে,

—I had never heard of Hastings having any qualities except for seducing his friends' wives.

কথাটা মনে পড়তেই হেস্টিংস অফিসঘরে একা একাই হেসে উঠলেন। তারপর গ্লাসে আরেকটু রঙিন জল চালান করে সুখস্মৃতিতে ডুব দিলেন।

ম্যারিয়ানার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হবার আরেকটা কারণ ছিল। জাহাজে হেস্টিংস অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীমতী ইমহফ তাঁর সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে সারিয়ে তুলতে লাগলেন। যতদিন না হেস্টিংস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন ততদিন শ্রীমতি ইমহফ তাঁকে সঙ্গ দিলেন। আগুন যে দুই তরফেই সমান লেগে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো বেশ কয়েকবার। ইমহফ সাহেব সবই বুঝলেন। তিনিও ছিলেন ধুরন্ধর। তিনি সব বুঝেও মৌন রইলেন।

জাহাজেই সমস্ত পক্ষ মিলে ঠিক করলো যে ইমহফ সাহেব ম্যারিয়ানকে পরিত্যাগ করবেন। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা হবে জার্মানির আদালতে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর হেস্টিংস ম্যারিয়ান-কে বিবাহ করবেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে হেস্টিংস ইমহফ সাহেবকে বিপুল অর্থ দেবেন। ব্যস, সকল পক্ষের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

ইমহফ সাহেব ভারতে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর স্ত্রীর বর্তমান প্রেমিক ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। হেস্টিংস মাদ্রাজে গেলেন, হেস্টিংস কলিকাতায় এলেন। ইমহফও সস্ত্রীক সঙ্গে সঙ্গে এলেন। যদিও ততদিনে ম্যারিয়ান ইমহফের শয্যাসঙ্গিনী রইলেন না। তিনি তাঁর ভাবি স্বামী হেস্টিংসের সঙ্গেই থাকতেন।

কিছুকাল এভাবে কেটে যাওয়ার পর ইমহফ হেস্টিংয়ের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেলেন। তারপর বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি মিটিয়ে নিলেন জার্মানিতে গিয়ে। ব্যস ম্যারিয়ান ইমহফ হয়ে গেলেন ম্যারিয়ান হেস্টিংস।

—আসতে পারি?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল হেস্টিংসের। অফিসে এসে ঢুকেছেন বারওয়েল সাহেব। হেস্টিংস মাথা নেড়ে সম্মতি দিতেই তিনি কেবিনে প্রবেশ করলেন।

—এই অসময়ে?

বারওয়েল বললেন,

—মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে অনশন করছেন। এভাবে যত্রতত্র তিনি আহার করবেন না।

হেস্টিংস তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন,

—ব্লাডি নানকুমার। আর ওকে তোমরা মহারাজ মহারাজ বলা বন্ধ করো। শুধু নানকুমার বলে ডাকবে।

বারওয়েল বললেন,

—ওকে স্যর। সরি।

হেস্টিংস বললেন,

—সে আহার করুক না করুক তাতে কী এলো গেলো। তার

ফাঁসি নিশ্চিত। সে আসামি। সে জোচ্চুরি করেছে। এলাইজা ইম্পে-কে বলো আমি কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। তোমরাও থাকবে। সাক্ষীদের কী হলো?

বারওয়েল জানাল,

—সাক্ষীদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে।

হেস্টিংস এক টানে গ্লাসের তরল শেষ করে বললেন,

—কোনো গড়বড় যেন না হয়। তাহলে যে গড়বড় করবে তাকেই ফাঁসিতে চড়াবো।

বারওয়েল বুঝলেন এখন এখানে থাকা সমীচীন হবে না। তিনি গভর্নর জেনারেলকে সেলাম করে বেরিয়ে গেলেন।

হেস্টিংস অফিসরুমের হলদে আলোয় একা বসে রইলেন। তাঁকে দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। ক্ষমতালিপ্সু মাতাল এক ইংরেজ যে যেন তেন প্রকারেন এক ভারতীয় ব্রাহ্মণকে হত্যার ছক কষছে।

* * *

এই ঘটনাপ্রবাহের কিছুকাল আগের কথা।

সুপ্রিম কোর্টের আগে কলিকাতায় যে বিচারালয় ছিল তাকে বলা হতো মেয়র কোর্ট। লালদীঘি সংলগ্ন এলাকায় সেই কোর্ট বসতো। ইংরেজে ইংরেজে কিম্বা ইংরেজ ও দেশীয় লোকের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তার বিচার হতো মেয়র কোর্টে। এই মেয়র কোর্টের বিচারপতির নাম ছিল অল্ডারম্যান। কলিকাতার বাঙালিদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা হলে তার বিচার হতো কাছারি আদালতে।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে ১৭৭৪ সালে কলিকাতায় প্রথম সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। সেই কোর্টের প্রথম।

প্রধান বিচারপতি ছিলেন স্যার এলাইজা ইম্পে। তিনজন সাধারণ বিচারপতি ছিলেন স্যার স্টিফেন সিজার লেমেইস্টার, স্যার জন হাইড এবং স্যার রবার্ট চেম্বার্স যিনি পরবর্তীকালে ১৭৯১ সালে দ্বিতীয় প্রধান বিচারপতি ঘোষিত হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হবার সময় একটি কাউন্সিল গঠন করা হলো। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, কর্নেল মনসন, জেনারেল ক্লেভারিং এবং বারওয়েল কাউন্সিলের নির্বাচিত চারজন সভ্য মনোনীত হলেন। একমাত্র বারওয়েল সাহেব ছাড়া বাকি তিনজন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রথমবার সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছিলেন। বারওয়েল হেস্টিংসের পোষা কুকুরের মতো তাঁর সামনে লেজ নাড়তো। কিন্তু এই তিনজন ছিলেন স্পষ্টবাদী, উদারচেতা ও ন্যায়পরায়ণ। ওঁরা আসার পর হেস্টিংসের যথাচ্ছাচার এই প্রথমবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদিও বড়লাটের স্বেচ্ছাচার বজায় ছিল তবু একটা লাগাম পরানো হয়েছিল সেই স্বেচ্ছাচারের উপর।

এখানে বারওয়েলের বর্ণনা প্রয়োজন। যে কয়েকজন ইংরেজ তাঁতি ও লবণ ব্যবসায়ীদের শোষণ করে ধনকুবের হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বারওয়েল অন্যতম। তার নামে বেশ কয়েকবার তৎকালীন কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। প্রতিবারই তিনি অভিযোগকারীদের গ্রেপ্তার করে ঢাকার কারাগারে পাঠিয়ে দিতেন। বারওয়েল বর্তমান কাউন্সিলে হেস্টিংসের ডান হাত হিসেবেই বিরাজমান হলেন।

ক্লাইভের লবণের বাণিজ্য কোম্পাইর ডিরেক্টরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেই লবণের অনৈতিক ব্যবসা আবার চালু করলেন

ওয়ারেন হেস্টিংস। যেহেতু বড়লাট হয়ে নিজে সরাসরি ব্যবসা করতে পারেন না তাই তাঁর হয়ে বারওয়েল সেই সমস্ত ব্যবসার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কোম্পানির কেউ এই ব্যবসা সরাসরি পরিচালনা করতে পারবে না। তাই বারওয়েল অর্থপিশাচ কিছু বাঙালির সাহায্য নিলেন। বেনামীতে লবণের মহাল ইজারা দিয়ে এই কাজ করা হতো। এই কাজ করতে গিয়ে বারওয়েলের পরিচয় হয় কান্ত পোদ্দার ও কামালউদ্দিন খাঁ-এর সঙ্গে। এই দুইজন পরবর্তীকালে হেস্টিংসের দুই শাগরেদে পরিণত হয়। বারওয়েল বেনামীর এই ব্যবসার বেনামীদের অল্প অর্থ ঠেকিয়ে বাকি সম্পূর্ণ অর্থ আত্মসাৎ করতে লাগলেন। হেস্টিংস এসবের হিসেব রাখতেন না। ফলে তাঁর অধস্তনেরা কী করছে তাঁর সঠিক হিসাব তার কাছে থাকতো না।

বড়লাটের কাউন্সিলে ক্লেভারিং, মনসন, ফ্রান্সিস তাঁদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করলেও তাতে ফলপ্রসূ কিছু হতো না। কারণ হেস্টিংস ও বারওয়েল একে অপরের সমর্থন করে বারবার পার পেয়ে যেত।

তবে যত দিন এগোতে লাগলো ততই এই তিনজন কাউন্সিল মেম্বার হেস্টিংসের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তার উপর মহারাজ নন্দকুমারের ভয় তো ছিলোই। একটা কিছু যে শীঘ্রই করতে হবে তা হেস্টিংস বুঝতে পারছিলেন।

ঠিক এরকমই এক পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেস্টিংসের বাল্যবন্ধু স্যর এলাইজা ইম্পে ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়ে ভারতে এলেন।

হেস্টিংস এবার হাতে চাঁদ পেলেন। শুধু একটা সুযোগের

অপেক্ষায় তক্কে তক্কে রইলেন। সুযোগ সহসাই হাতের কাছে এলো। তবে তার আগে একটা বড়সড় ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটনাটি এতোই বিপাকে ফেলেছিল যে হেস্টিংসকে পদত্যাগপত্র অবধি লিখতে হয়েছিল।



বারওয়েলের অত্যাচার বাড়তে লাগলো। তাতে বাংলার বিভিন্ন জেলার জমিদারেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। কিন্তু বারওয়েলের পিছনে যেহেতু হেস্টিংস ছিলেন তাই কেউ তাকে বিশেষ ঘাটাতে সাহস পেতো না। সবাই জানতেন যদি কেউ হেস্টিংসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন, তিনি মহারাজা নন্দকুমার।

এটা সেই সময় যখন কোম্পানির সাধারণ কর্মচারীদের বিরুদ্ধেই কেউ দাঁড়াবার সাহস করতো না। সেই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার বড়লাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ হেনেছিলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন একমাত্র দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী মহারাজা নন্দকুমার দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের নিয়ে প্রায়ই বৈঠকখানায় বসতেন এবং মতলব কষতেন।

হেস্টিংস ও বারওয়েলের বক্তব্য ছিল দিল্লির বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পেয়েছে কোম্পানি। তাই জমিদারদের দখলে জমি থাকার কোনো মানে নেই। জমিদারদের উৎখাত করে দাও। একমাত্র স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস এই নীতির বিরোধিতা করে বলেছিলেন,

—ভূমিতে জমিদারে সীমাবদ্ধ অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার

মোঘল বাদশাহ অব্দি মেনে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের উৎখাত করার কোনো মানে হয় না।

হেস্টিংস এসব কথা শুনে গজগজ করতো। বাকি দু'জন কাউন্সিল সভ্যও স্যর ফ্রান্সিসের পক্ষে রায় দিতো। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হতো না।

উপরন্তু কাউন্সিলের সকলের শায়েস্তা করার জন্য রংপুরের অন্তর্ভুক্ত বাহেরবন্দ পরগণার জমিদার রানি ভবানী-কে জমিদারি থেকে উৎখাত করলেন। তারপর তাঁর অন্যতম শাগরেদ কান্ত পোদ্দারকে সেই পুরস্কৃত করলেন। কান্ত পোদ্দারের ছেলে লোকনাথ-কে সেই জমিদারি দান করলেন।

হেস্টিংস ছিলেন ধূর্ত শেয়ালদের মতো। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে মহারাজ নন্দকুমার তাঁর ধ্বংসসাধনের জন্য নিজের মহলে বসে মতলব করছেন। তাই হেস্টিংস এবার তাঁর কুচক্রী পারিষদদের নিয়ে নন্দকুমারের সর্বনাশের ফন্দি আটতে শুরু করলেন। সেই আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকতো নবকৃষ্ণ মুন্সী, কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি বণিক।

একমাত্র নন্দকুমারকে জব্দ করতে পারলেই এই বাংলায় একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় করা যাবে। সাধারণ মানুষ ভয় পাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। সাধারণ বণিক কোম্পানি না ভেবে দেশের রাজা ভাবতে শুরু করবে।

১৭৭৫ সালের ১১ মার্চ ঘটনাটা ঘটে গেলো। হেস্টিংস যা ভয় পেয়েছিলেন তাই ঘটলো। স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের নিকট মহারাজা নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র পাঠালেন। সেই অভিযোগ পত্রে মহারাজা নন্দকুমার লিখছেন,

'গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎকোচ-গ্রহণ ও অন্যান্য অসদাচরণের কথা আজ আমি কাউন্সিলের সামনে প্রকাশ করছি। এই অভিযোগ-পত্র পাঠ করে কাউন্সিলের সভ্যরা আমাকে অসৎ চরিত্রের মানুষ বলে মনে করবেন। কারণ আমি এই সমস্ত কিছু আগে থেকেই জানতাম। হেস্টিংসের সঙ্গে আমিও এর ভাগিদার ছিলাম। কিন্তু এই সত্য গোপন রাখলে আমি আরও অধিক অপরাধ করবো এবং আমার চরিত্র অধিকতর কলুষিত হবে। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসনকর্তা। তাই দায়ে পড়ে আমাকে তাঁর অন্যায়ে-অত্যাচারে সঙ্গ দিতে হয়েছে।

গভর্নর হয়ে প্রথমবার বাংলাদেশে এসে হেস্টিংস আমাকে বলেছিলেন মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় কোম্পানির রাজস্ব খুব বেশি পরিমাণে আত্মসাৎ করেছেন। সে কথা তিনি জানতে পেরেছেন। তাঁদের পদচ্যুত করে তিনি আমাকে নায়েব-সুবাদারের পদে নিউক্ত করবেন তিনি আমার কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই আমি প্রথমে তাঁর অনুরোধে রেজা খাঁ-র হিসাব পরীক্ষা শুরু করি।

মহম্মদ রেজা খাঁ-এ প্রদত্ত হিসাব থেকে ওখন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো যে তিনি অন্যূন তিন কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তখন উপায়ান্তর না দেখে তিনি আমাকে দুই লক্ষ এবং হেস্টিংসকে এগারো লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাইলেন। হেস্টিংসের কাছে যখন আমি রেজা খাঁ-র প্রস্তাবের উল্লেখ করি তখন তিনি এই উৎকোচ গ্রহণ করতে ঘোর আপত্তি জানান। উল্লেখ্য ওখনকার কথা বলছি ততদিনে রেজা খাঁ কারাগারে বন্দি। রেজা খাঁ দোষী

প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং উৎকোচের কথা বলা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হেস্টিংস তাঁর প্রতি আবার দয়াশীল হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই রেজা খাঁ মুক্তি পেলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে হেস্টিংস তার থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছিলেন।

অধিক লাভের আশায় দুর্ভিক্ষের সময় মহম্মদ রেজা খাঁ যে ধান কিনে গোলাবন্দি করে রেখেছিলেন তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কোনোরকমের ত্রুটি বা অপরাধ ছাড়া শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন করার জন্য রানি ভবানী-কে বাহেরবন্দের জমিদারি থেকে উৎখাত করেছেন হেস্টিংস। সেই জমিদারি শ্রীকান্ত পোদ্দারের পুত্র লোকনাথ নন্দী-কে হেস্টিংস উপহার দিয়েছেন।

দিল্লির বাদশাহ আমাকে একটা বহুমূল্য পালকি উপহার দিয়েছিলেন সম্মানস্বরূপ। সেই পালকি পাটনা পর্যন্ত পৌঁছলে রাজা সিতাব রায় তা আটক করে। হেস্টিংস সেই পালকি পাটনা থেকে নিজের কাছে এনে রেখে দিলেন। আজ পর্যন্ত সেই সম্মানস্বরূপ প্রাপ্ত পালকি আমি চোখে দেখিনি।

আমার পুত্র রাজা গুরুদাসকে নায়েব-সুবাদারের পদে এবং মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবিকার পদে নিযুক্ত করার সময় হেস্টিংস উৎকোচ গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত আমি নিজে সেই উৎকোচ পাঠাই। তাই সাক্ষী আমি নিজে। আমার গোমস্তা চৈতন্যনাথ, হেস্টিংসের ভৃত্য জগন্নাথ, বালকৃষ্ণ এবং তাঁর বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের মাধ্যমে আমি তাঁকে তিন থলি স্বর্ণমুদ্রা পাঠাই। প্রথম

থলিতে ১৪৭১টি মোহর, দ্বিতীয় থলিতেও ১৪৭১টি মোহর এবং তৃতীয় থলিতে ৯৮০টি মোহর ও ৫৭০টি আধুলি ছিল। দ্বিতীয়বার হেস্টিংসকে ১৪৭০টি মোহর পাঠাই। এগুলোর হিসাব ও প্রমাণ আমার কাছে আছে।

হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ গিয়ে মণিবেগমকে নবাব মোবারকদৌল্লার অভিভাবিকা ও নবাবের বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী নিযুক্ত করে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন এবং নবাবের গর্ভধারিণী বকুবেগমকে পদচ্যুত করেন। হেস্টিংস কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে মণিবেগম মহারাজ গুরুদাসের মাধ্যমে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে গভর্নর সাহেবকে যে বাকি দেড় লক্ষ টাকা পাঠানো বাকি আছে তা কীভাবে পাঠাবেন তিনি। আমি নিজে হেস্টিংসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন কাশিমবাজারে কান্ত পোদ্দারের ভাই নুরসিংহের কাছে ওই টাকা দিতে হবে। তারপর রাজা গুরুদাস আমাকে লিখে পাঠান যে কাশিমবাজারে দেড় লক্ষ টাকা নূরসিংহের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

হেস্টিংসের সমস্ত জঘন্য ব্যবহার আমি কাউন্সিলে ও সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারি বলে সে আমাকে ভয় পায়। তিনি সারাদিন আমার ধ্বংসের চিন্তা করে চলেছেন। আমার পরম শত্রু মোহন প্রসাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। মোহনপ্রসাদকে ধীরে ধীরে ক্রীড়নকে পরিণত করেছেন। গভর্নর জেনারেলের মতো উচ্চপদে আসীন ব্যক্তি মোহন প্রসাদের মতো অতি ক্ষুদ্র একজন লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান এবং একত্রে ফুর্তি করেন। তাঁর বাড়িতে মোহনপ্রসাদ তাঁরই সমকক্ষ লোক।

যাই হোক। এই অভিযোগ পত্র আর দীর্ঘ করবো না। শুনেছি আপনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, নির্ভীক একজন সভ্য। তাই আপনাকেই লিখিতরূপে এই অভিযোগ পত্র পাঠালাম। আশাকরি শীঘ্রই আপনি এর বিহিত করবেন।'

এখানে মণিবেগম সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। মির জাফরের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রকে হেস্টিংস নবাব হিসেবে ঘোষণা করলেন। ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানির ডিরেক্টররা বারবার হেস্টিংসকে মনে করালেন একজন সুযোগ্য সৎলোককে যেন নাবালকের অভিভাবক করা হয়। হেস্টিংস অনেক ভাবনাচিন্তা করে সুযোগ্য ও সৎ লোক খুঁজ বের করলেন। নাবালকের বিমাতা মণি-বেগম। নবাবের গর্ভধারিণী তাঁর অভিভাবিকা হতে পারলেন না। তাহলে এই মণি বেগম কেমন মানুষ?

বিশু বেগ নামে একজন লোক প্রথমে তাকে ক্রীতদাস হিসেবে কিনে নাচ ও গানের তালিম দেয়। বিশু বেগের একটা বাইজিখানা ছিল। মণিবেগম সেখানের সবিচেয়ে বিখ্যাত নর্তকী। তখন তার নাম ছিল মণি। মির জাফরের সঙ্গে বাইজিদের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। সেরকমই একদিন এই মণি মির জাফরের চোখে পড়ে। মির জাফর তাকে চোখে হারান। তার নাচ গানে তিনি বিমোহিত, তার সৌন্দর্যে তিনি পাগল পাগল হয়ে গেলেন। শুধু কয়েকটা রাতে তাঁর মন ভরলো না। একদিন এই মণি বাইকেই বেগম করে প্রাসাদে তুললেন তিনি। সেই মণি বাইকেই নবাবের অভিভাবিকা করলেন হেস্টিংস। যদিও সমস্তটাই উৎকোচের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল।

স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস মহারাজা নন্দকুমারের পাঠানো অভিযোগপত্র পেয়ে চিন্তায় পড়লেন। স্বয়ং বড়লাটের বিরুদ্ধে

অভিযোগ। তাতে কী? সঠিক সিদ্ধান্তই নিতে হবে। তিনি বাকিদেরও এই ব্যপারে জানালেন। স্থির হলো সবাই মিলে হেস্টিংসের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন।

হেস্টিংস ছিলেন কাউন্সিলের সভাপতি। কাউন্সিলে সম্পূর্ণ অভিযোগপত্র পাঠ করা হলো। রাগে, আক্রোশে ফেটে পড়লেন হেস্টিংস। সকলের সামনে এভাবে তাঁর সম্মানহানি হবে তা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর কথা বার্তায় শুধু গভর্নর হবার অহঙ্কার ঝড়ে পড়লো। তিনি স্যর ফ্রান্সিস ও জেনারেল ক্লেভারিংকে উদ্দেশ করে বললেন,

—আমি বেশ ভালোই বুঝতে পারছি, আপনারাই নানকুমারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে এই হীন অভিযোগ এনেছেন।

স্যর ফ্রান্সিস উত্তরে বললেন,

—এতে ষড়যন্ত্রের প্রশ্নই উঠছে না। যে সকল অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত হোক। সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে।

হেস্টিংস উলটে বললেন,

—নানকুমার একটি বজ্জাত। তাঁর অভিযোগ ঠিক কি ভুল তার তদন্ত হতেই পারে না।

জেনারেল ক্লেভারিং বোঝাবার চেষ্টা করলেন,

—মহারাজ নন্দকুমার সম্ভ্রম ও পদমর্যাদায় এই দেশের প্রথম সারির ব্যক্তি। তিনি বাংলাদেশের দেওয়ান-সুবাদারের মতো উল্লেখযোগ্য পদ সামলেছেন। পদমর্যাদায় তিনি আপনার থেকে কোনো অংশে কম নন। তিনি যখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তার তদন্ত হওয়া আশু প্রয়োজন।

হেস্টিংস এবার ধৈর্যহারা হলেন।

—আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের তদন্ত হলে এই মুহূর্তে

আমি কাউন্সিল ভেঙে দেবো। মনে রাখবেন আমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা। আমি গভর্নর জেনারেল। আমি অপরাধীর বেশে এখানে কখনোই উপস্থিত হবো না।

কর্নেল মনসন অব্দি চেষ্টা করলেন,

—আরে আপনি নির্দোষ হলে তো আপনার পদমর্যাদায় কোনো ক্ষতি হবে না। সেটা প্রমাণ হয়ে গেলেই সব মিটে যাবে।

এবার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে ক্রোধে মত্ত হলে হেস্টিংস। তিনি বললেন,

—আমি গভর্নর জেনারেল। আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করার অধিকার আপনাদের নেই তো তদন্ত করবেন কীভাবে?

স্যর ফ্রান্সিসও কম যান না। তিনি বললেন,

—এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার একটাই উদ্দেশ্য ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অসদাচরণ ও কুক্রিয়ার প্রতিকার করা। সেজন্য কোম্পানির যেকোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ হোক না কেন তার তদন্ত হবেই।

হেস্টিংস তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। যেতে যেতে বললেন,

—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের পক্ষে যা সম্ভব হয় করুন। আমিও দেখে নিচ্ছি।

এই সম্পূর্ণ বাকবিতণ্ডায় একমাত্র বারওয়েল চুপ করে বসেছিল। সে শুধু নিজের আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে হেস্টিংসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

বাকি তিন সভ্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মহারাজা নন্দকুমারকে কাউন্সিলের সামনে ডাকলেন। বদ্ধ কক্ষের এই সভায় মহারাজা নন্দকুমার খুব স্পষ্ট নির্ভীকভাবে নিজের বয়ান

রাখলেন। অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য তিনি অনেক সাক্ষীর নামের উল্লেখ করলেন। এবার এই সাক্ষীর তালিকায় ছিল বেনিয়ান কান্ত পোদ্দারের নাম।

কান্ত পোদ্দার শমন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে হেস্টিংসের কাছে এলো। হেস্টিংস কান্ত পোদ্দারের পিঠে হাত রেখে তাকে নিয়ে অফিসের ভিতরে ঢুকে পড়লো। কাউন্সিলে কী তামাশা হবে তার নাট্যরূপ সেখানেই স্থির হয়ে গেলো।

নির্দিষ্ট দিনে কাউন্সিলে উপস্থিত হল কান্ত পোদ্দার। সেদিন আরও কয়েকজন সাক্ষীও উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমেই ডাকা হল কান্ত পোদ্দারকে। কান্ত পোদ্দার সকলের সামনে কাউন্সিলকে একটা ইয়ার্কির আখাড়ায় পরিণত করল। সে বলল,

—এটা কীসের কাউন্সিল. যে কাউন্সিলে হেস্টিংস নাই অর্থাৎ সভাপতি উপস্থিত নাই সেই কাউন্সিলের কোনো মূল্য আছে নাকি। আমি এই বে-আইনি কাউন্সিলে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য নই।

সামান্য এক বেনিয়া কান্ত পোদ্দারের এই ঔদ্ধত্যে সভ্যগণ সবাই অসন্তুষ্ট হলেন। সাক্ষীদের সামনে কাউন্সিলের অপমান কেউই মেনে নিতে পারলেন না। কান্ত পোদ্দার এই সাক্ষ্য দিয়ে এজলাস ত্যাগ করেছিল। জেনারেল ক্লেভারিং আদেশ দিলেন,

—কান্ত পোদ্দারকে চাবুক মারতে মারতে নিয়ে এসো।

এই কথা শুনে হেস্টিংস পাল্টা উত্তর দিলেন,

—যদি কান্ত পোদ্দারকে কেউ চাবুক মারে, তবে সে যেন মনে রাখে যে আমি নিজে কান্তর পক্ষ থেকে তাকে চাবুক মারবো।

জেনারেল ক্লেভারিং এই উত্তরে রীতিমতো খেপে গেছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস ও মনসন দেখলেন এবার কাউন্সিলে হেস্টিংস আর ক্লেভারিংয়ে হয়তো হাতাহাতি হয়ে যাবে একদিন। অনেক চেষ্টা

চরিত্র করে ক্লেভারিংকে নিরস্ত করা গেল।

এর পরেরদিনেই কাউন্সিল ভেঙে দেওয়া হল। কাউন্সিলের আর কোনো এক্তিয়ার রইল না।

এই ঘটনায় মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের আক্রোশ সীমা অতিক্রম করলো।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



কাউন্সিলের ঘটনাটির পর থেকে হেস্টিংসের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশ কীভাবে চলছে, রাজস্ব কত আসছে, ইংলন্ডেশ্বর কী ভাবছে তার থেকেও তাঁর অধিক চিন্তা ছিল কীভাবে নন্দকুমারকে একেবারে শেষ করে দেওয়া যায়।

এই কাজে হেস্টিংসকে সাহায্য করতে কিছু লোক এগিয়ে এলেন। এই লোকগুলো হেস্টিংসের একান্তই অনুগত। লর্ড ক্লাইভের প্রাক্তন বেনিয়ান রাজা নবকৃষ্ণ, তাঁর নিজের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, বেনিয়ান কান্ত পোদ্দার তো ছিলোই। এগিয়ে এলেন বাল্যবন্ধু তথা ভারতের প্রথম প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে। শলাপরামর্শ চলতে থাকলো। নানা লোকের বাড়িতে আসা যাওয়া চলতে থাকলো। কোথায় নন্দকুমার কী কী কাজ করেছে তার ফিরিস্তি জানতে উঠেপড়ে লাগলেন সকলে। কোথাও একটা ছোট্ট ভুল যদি বের করা যায় তার ভিত্তিতেই রাজদণ্ড নেমে আসবে মহারাজা নন্দকুমারের ঘাড়ে। তক্কে তক্কে রইলেন হেস্টিংস।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পরিচয় জানা প্রয়োজন। দিনাজপুরের রাজার মৃত্যুর পর রাজার ছোট ভাইয়ের রাজা হওয়ার কথা ছিল। রাজার এক নাবালক পুত্র ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের দালালি মারফত

সেই নাবালক-কে হেস্টিংস রাজা করলেন। গঙ্গাগোবিন্দ রাজপরিবার থেকে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা পাইয়ে দিলে হেস্টিংস-কে। হেস্টিংস খুশি হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কর আদায় কমিটির দেওয়ান নিযুক্ত করলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-কে। ফলে কর আদায়ের সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হল গঙ্গাগোবিন্দের উপর। এছাড়া বাংলাদেশে কার কী সম্পত্তি আছে, জমি-জমা আছে, দলিলপত্র আছে তা পরীক্ষা করার জন্যেও হেস্টিংস এক কমিটি গঠন করলেন। সেই কমিটির নাম দেওয়া হলো আমিনী কমিটি। গঙ্গাগোবিন্দ সেই কমিটিরও হর্তা কর্তা-বিধাতা হয়ে গেলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সাধারণ মানুষ উপর অত্যাচার করতেন। গঙ্গাগোবিন্দের এই চরিত্র জেনেও হেস্টিংস তাঁকেই এই সমস্ত কার্যভার দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বহু জায়গায় জমিদারির ব্যবস্থাদিও করে দিয়েছিলেন। এতো সবের একটাই কারণ ছিল। হেস্টিংসের সমস্ত প্রকার উৎকোচ গ্রহণের একমাত্র দালাল ছিলেন এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। তার পরামর্শেই সমস্ত কাজ করতেন হেস্টিংস। তিমি তাকে এতটাই ভালোবাসতেন যে একেবারে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েও গঙ্গাগোবিন্দের জন্য টাকা পাঠাতেন তিনি। একবার ছাব্বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এই গঙ্গাগোবিন্দ হেস্টিংসের কতটা অনুগত ছিলেন।

এই গঙ্গাগোবিন্দের মাধ্যমেই এই কাহিনির এক অমোঘ চরিত্র কামালউদ্দিনের প্রবেশ হয় এই কাহিনিতে। কামালউদ্দিনের সঙ্গে গঙ্গাগোবিন্দের শুরুতে বাদ-বিবাদ ছিল। কিন্তু যত সময় এগিয়ে গেলো কামালউদ্দিন গঙ্গাগোবিন্দ তো বটেই, হেস্টিংসেরও প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন।

কামালউদ্দিনের প্রাপ্য ছাব্বিশ হাজার টাকা গঙ্গাগোবিন্দের কাছে জমা ছিলো। সে টাকা গঙ্গাগোবিন্দ তাকে দিচ্ছিলেন না। ওই টাকা উদ্ধারের জন্য গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে দুটো দরখাস্ত লিখে মহারাজ নন্দকুমারের কাছে জমা করে কামালউদ্দিন। সেই ছাব্বিশ হাজার টাকা আদায় করে দিতে পারলে মহারাজ নন্দকুমারকেও ছয় হাজার টাকা দেবে বলে কামালউদ্দিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

কিন্তু এই ঘটনা ঘটার আগেই মুনশি সদরুদ্দিনকে এই কথা জানায় কামালউদ্দিন। মুনশি সদরুদ্দিন বললেন,

—কোনো দরকার নেই দরখাস্ত করার। আমি আপোস করিয়ে সমস্ত টাকা আদায় করে দিচ্ছে। তোমার ছয় হাজার টাকাও বেঁচে যাবে। দরখাস্ত ফিরিয়ে আনো।

কামালউদ্দিন খুশি হয়। সে মহারাজা নন্দকুমারের কাছে যায় দরখাস্ত ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু মহারাজা নন্দকুমার তা ফেরত দিলেন না। বরং কামালউদ্দিনকে জোসেফ ফোকস এবং তাঁর জামাই রায় রাধাচরণ রায়ের কাছে যেতে পরামর্শ দেয়।

এই ঘটনা জানার পর মুনশি সদরুদ্দিন স্বভাবতই রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন,

—চলো হেস্টিংসের দরবারে। মহারাজ নন্দকুমারের শেষ দেখে ছাড়বো।

কামালউদ্দিনের মতো অতি সাধারণ মানুষ হেস্টিংসের সভায় এসে দেখলেন এক থেকে এক মহারথী বসে আছেন। হেস্টিংস পাইপ টানছেন। আশপাশে কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মতো বাঘা বাঘা লোক। এমনকী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে অব্দি সেখানে আছেন। কামালউদ্দিন ঢোক

গিললো। হেস্টিংস ইশারায় ইম্পেকে কিছু বললেন। ইম্পে হাসলেন।

এলাইজা ইম্পে তাঁর হাতে একটি সুদৃশ্য কাচের গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাতে থাকা বরফঘন সোনালি রঙের তরল কামালউদ্দিনকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। ইম্পে সেই গ্লাস এগিয়ে দিলেন কামালউদ্দিনের দিকে। এতো বড় মাপের ব্যক্তি তাঁকে স্কচ অফার করছে সেটা কামালউদ্দিন ইহজীবনে কল্পনা করতে পারেনি। ইম্পে বললেন,

—ভয় নেই। পান করো।

কামালউদ্দিন আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তরল তায় গলায় ঢেলে দিলো। মুহূর্তের মধ্যে শরীরটা গরম হয়ে উঠলো। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। পৃথিবীটা ঈষৎ দুলে উঠলো। আর এক গ্লাস এল।

ইম্পে বললেন,

—পান করো আর তোমার কাহিনি আমাদের বলো।

দুই হাতে গ্লাসটাকে আঁকড়ে ধরলো কামালউদ্দিন। তারপর সে বাকি কাহিনি বলল,

—আমি মহারাজ নন্দকুমারের কথা মতো জোসেফ ফোকসের সঙ্গে দেখা করি। ফোকস প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন,

—লবণের মহাল ইজারা পাওয়ার জন্য তুমি কি কোনো ইংরেজকে ঘুষ দিয়েছো?

আমি উত্তরে বলি,

—না। কখনোই না।

ফোকস আমাকে জোর করেন,

—না তুমি দিয়েছো। মিথ্যে কথা বলছো।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে ফোকসের পুত্র ফ্রান্সিস ফোকস এলেন। বাপ বেটার কথা হতে থাকলো। সে ভাষা আমি কিছু বুঝি না। আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তাঁরা আমাকে রায় দিলেন,

—তুমি আজ ফিরে যাও। আগামিকাল ঠিক এই সময়ে আসবে।

পরদিন আমি আবার গেলাম। জোসেফ ফোকস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—তুমি ভান্সিটার্ট সাহেবকে ঘুষ দিয়েছো?

আমি আবার সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বলি,

—না, কখনোই না।

পরপর দুইদিন এভাবে আমাকে জেরা করার পর তৃতীয়দিনেও আমাকে ডেকে একই প্রশ্ন করেন। আমি তাদের জানাই,

—আমি ইজারাদার। আমি কাউকে ঘুষ দিইনি।

স্যর এলাইজা ইম্পে এবার বিরক্ত হলেন। কামালউদ্দিনের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিলেন।

—কামালউদ্দিন তারপর কী হলো সেটা বলো। একই কথা তুমি তিনবার বলেছো।

কামালউদ্দিন এখন আর নিজের কাবুতে নেই। সে গড়গড় করে বলতে থাকে।

—ফোকস সাহেব এরপর আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করলেন। হেস্টিংস ও বারওয়েল সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ করে দরখাস্ত করার জন্য জোর করেন। আমি অসম্মত হইলে আমাকে বন্দি করার কথা বলেন তিনি। আরেকটা কথা, সেদিন সেখানে মহারাজা নন্দকুমার উপস্থিত ছিলেন।

ব্যস। হেস্টিংস তাঁর পাইপে সুখটান দিলেন। নন্দকুমারের

কফিনের প্রথম পেরেক তিনি খুঁজে পেয়ে গেছেন।

এলাইজা ইম্পে সেটা লক্ষ করেও নিজের প্রশ্নবাণ হানতে থাকেন।

—তারপর তুমি কী করলে?

কামালউদ্দিন বলে,

—সেদিনের মতো আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। এই ঘটনা নিয়ে আমি বারবার ভাবতে থাকি। আমার ঘুম ছুটে যায়। শরীর অসুস্থ হয়। গভর্নর সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি ভাবতেই পারছিলাম না। তারপর আমি ফোকস আর মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ লিখে দরখাস্ত করি গভর্নরের কাছে।

এতক্ষণে হেস্টিংস কথা বললেন,

—কিন্তু সেই অভিযোগে এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছিল না যা তুমি এতক্ষণ ধরে বললে।

কামালউদ্দিন গভর্নরের কথায় ঢোক গেলে। তারপর বললো,

—আমার কাছে সেদিন মুনশি ছিল না। তাই সমস্ত কিছু লিখিতে পারিনি।

হেস্টিংস বললেন,

—ওয়েল তাহলে আমি তোমাকে এক্ষুনি মুনশি দিচ্ছি। তুমি এখন যা যা বললে তা অভিযোগে যোগ করো এবং সেটা আমার দপ্তরে জমা করো।

কামালউদ্দিন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে তাতে রাজি হল। মুনশি ডাকা হলো। লেখা হতে থাকলো মহারাজ নবকুমারের মৃত্যুশয্যার মহামন্ত্র।

এলাইজা ইম্পে এসে দাঁড়ালেন হেস্টিংসের সামনে।





—ভাই, মানতে হবে তোমাকে।

হেস্টিংস মুচকি হেসে বললেন,

—বাড়ি যেতে দিলে নানকুমারও তোমার মতো ওকে দামি মদ গেলাবে। হাতে কিছু ধরিয়ে দেবে। ব্যস, কাহিনি ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ধরো তক্তা মারো পেরেক।

দু'জনেই হাসতে লাগলেন। ওদিকে মুনশি অভিযোগ লিখতে থাকলো। মহারাজ নন্দকুমার তখনো জানেন না তাঁর ভবিতব্যে কী লেখা আছে। তিনি শেষ বয়সে এসে দেশমাতৃকার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু শুরুতে নেওয়া একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের মাশুল তাঁর জন্য তৈরি হচ্ছিলো। যদিও এতো কঠিন দণ্ডের অধিকারী তিনি ছিলেন না। তবু কী আর করা যাবে!

*　　*　　*

জোসেফ ফোকস কে? তিনি একজন দো-ভাষী বা ইন্টারপ্রেটার। মামলায় দুই পক্ষের দরখাস্ত সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করতেন। এই কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ ছিল কারণ সেই সময়ে সবাই বাংলা এবং ইংরেজি দুটো ভাষা একত্রে জানতেন না। ইংরেজ বিচারকদের সাক্ষীদের জবানবন্দি ও মামলার বিষয়টি ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেওয়া এবং দেশীয়দের বিচার প্রক্রিয়াটি বাংলায় বুঝিয়ে দেওয়া ছিল এদের প্রধান কাজ। সৎ লোক দো-ভাষী হিসেবে নিযুক্ত না হলে বিচারকার্য ভুলপথে চালিত হতো। এক পক্ষকে সুবিধা দেবার জন্য অন্য পক্ষের কথা ভুলভাবে বিচারকের কাছে পৌঁছে দিলেই কেল্লাফতে। কিন্তু এই জায়গাতে জোসেফ ফোকস-কে সকলে বিশ্বাস করতো। তিনি যে ন্যায়নিষ্ঠ একজন মানুষ সেটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করতেন।

*   *   *

জোসেফ ফোকস হেস্টিংসের সমস্ত অনাচারের কথা জেনে গিয়েছিলেন। এটা হেস্টিংসের একটা মাথাব্যথা হয়ে গিয়েছিল। তাই মহারাজা নন্দকুমারের পাশাপাশি ফোকস সাহেবের জন্যও একটা ব্যবস্থা তিনি খুঁজছিলেন। কামালউদ্দিনের অভিযোগের মাধ্যমে আরেকটা পথ সেখানে খুলে গেলো।

স্যর এলাইজা ইম্পে-র সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন হেস্টিংস।

—জোসেফ ফোকস বহুদিন ধরেই কাজেকর্মে বাধা দিচ্ছেন। তাঁর জন্যেও একটা ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে। যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে এক তিরে দুটোকেই কুপোকাত করা যাবে।

—দুটো?

—আরে নানকুমার তো আছেই।

—ওহো! তাই বলো। তা কী ভাবলে?

—কামালউদ্দিনের এই যে অভিযোগ সেটা শুধু নানকুমারকে ফাঁসানোর জন্য ব্যবহার না করে ফোকসকেও এই অভিযোগের মাধ্যমে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা যায়। আমরা অভিযোগে কামালউদ্দিন-কে দিয়ে লিখিয়ে নেবো যে এই দু'জনে মিলেই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল।

—তাহলে দু'জন না করে তিনজন করো। দেখো কানাঘুষোতে সকলেই জানে যে তোমার আর নন্দকুমারের ঝগড়ার কথা। জোসেফও তোমার উপর সন্তুষ্ট নন সেটাও সকলে জানেন। যদি শুধুমাত্র এই দু'জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করে তাদের তুমি সাজা

দাও তাহলে খুব বিশেষ একটা ভালো বার্তা যাবে না। বরং ওঁদের দু'জনের সঙ্গে রায় রাধাচরণ রায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করো। তারপর নানকুমারকে সাজা আমি দিচ্ছি। ওঁরা ততদিনে ভয় পেয়ে যাবেন। অল্প আধটু সাজা দিয়ে, কিছুদিন কারাগারে বন্দি করে ছেড়ে দেবো।

—হুম!

—শোনো সুপ্রিম কোর্ট সবে এসেছে। সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা বিষয়ে সকলেই ওয়াকিবহাল নয়। কোর্ট যে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সেটাও আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

—হুম!

হেস্টিং পাইপ টানটানতে ভাবতে থাকে। ইম্পে অধৈর্য হয়ে বলেন,

—কী হুম হুম করছো? বুদ্ধিটা কীরকম বলো?

—ভাবছি কতগুলো শয়তান মরলে একটা এলাইজা ইম্পে জন্মায়।

ঘরটা মুহূর্তে নৈশব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ইম্পে ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন হেস্টিংসের দিকে। হেস্টিংসও একটু ঘাবড়ে গেলেন যেন। তারপর ইম্পে মৌনতা ভেঙে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন,

—অনেকগুলো নয় একটা হেস্টিংস মরলেই একটা ইম্পে জন্ম নিয়ে নেয়।

হেস্টিংসও এবার হাসিতে যোগ দেন।

অন্যদিকে জোসেফ ফোকস মহারাজা নন্দকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন।

—অভিযোগ যখন এসেছে উত্তর তো দিতে হবেই। কিছু ভেবেছেন?

মহারাজ নন্দকুমারের প্রশ্নে ফোকস বললেন,

—আমি একটা চিঠি লিখেছি। কাউন্সিলে পাঠাবো। পড়ছি শুনুন।

—বেশ, পড়ুন তবে।

ফোকস চিঠি পড়া শুরু করলেন,

'শ্রদ্ধেয় কাউন্সিল'

কামালউদ্দিন আমার হাতে আরও একটা দলিল দিয়েছিল। আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে। এতে লেখা আছে যে সাধারণের কাছে ছোট করার জন্য এবং আমার অপযশ রটিয়ে দেবার জন্য গভর্নর জেনারেল অন্যায়ভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই দলিলের কথা মিথ্যা প্রমাণ হলে কামালউদ্দিনের নীচ প্রকৃতির কথা সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে অবশ্য আমি আনন্দ পাবো। আমার বিরুদ্ধে প্রথমে কামালউদ্দিন যা বলেছে তা গভর্নর জেনারেল বিশ্বাসযোগ্য ভেবেছে বলেই হয়ে মনে হয়েছে। সুতরাং সে যে আগে আমাকে পাঠানো তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেছে সেই নথি সে যেন অবশ্যই তার অভিযোগে যুক্ত করে দেয়। এটা আমার অনুরোধ। এই চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের নাম উল্লেখ করলাম বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা প্রমাণ করতে আমাকে এটা করতেই হলো।

বিনয়াবনত

জোসেফ ফোকস।'

মহারাজা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন।

—আরে করেছেন কী? আর তো কোনো কেস হবেই না।

ফোকস শুকনো হাসলেন।

—আপনি বড্ড আবেগী মানুষ। হেস্টিংসেকে আপনি চেনেন না। অন্য কোনো না কোনো উপায় সে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবে। সে একটা আস্ত শয়তান।

মহারাজা নন্দকুমার বললেন,

—সে না হয় আমি আবেগী। কিন্তু আপনি এই জিনিস কীভাবে বের করলেন?

জোসেফ এই প্রথম হাসলেন,

—কামালউদ্দিন কী জিনিস আপনি জানেন না। সে কাউকেই বিশ্বাস করে না। হেস্টিংসকেও না। তাই সে হেস্টিংসের সমস্ত মতলব আমাকে আগেই বলেছিল। ওখানেই আমি ওকে বসিয়ে অভিযোগ দায়ের করিয়ে নিয়েছিলাম। হেস্টিংসের মুনশি লিখিত অভিযোগ আমার কাছে এসে পৌঁছায় দু'দিন পর। ফলে রিসিভিং ডেটে আমি এগিয়ে থাকি।

মহারাজা নন্দকুমার তারিফের সুরে বললেন,

—ব্রিলিয়ান্ট। সত্যি আপনি নমস্য। এই যাত্রায় অন্তত আমরা দুই বুড়ো বেঁচে গেলাম।

জোসেফ মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ তা তো গেলাম।

মহারাজা বললেন,

—সব জমিদারদের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়ে গেছে। সবাই মিলে আমরা অভিযোগ করবো। আমি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে রাজি। সকলে আবার আসবে আমার মহলে। সেদিন সন্ধেবেলায়

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবো আমরা যে কবে কীভাবে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করলো। আর ধীরে ধীরে এই পুরো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিটাকেই দেশে থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে। ওরা বণিকের বেশ এসে রাজা হয়ে গিয়েছে। এটা আর মানা যাবে না।

জোসেফ বললেন,

—সব ঠিক আছে। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখে করুন। আমি ইংরেজ। তবু আমি কোম্পানির এই নীতিগুলোর পক্ষে নই। সে আপনারা নিজের দেশের জন্য যা ভালো মনে করেন করুন। তবে হেস্টিংসকে আগে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। নইলে সমাজের ক্ষতি। দরিদ্রদের সে পিষে মেরে ফেলছে। মধ্যবিত্তরাও আর পারছে না বাঁচতে। আত্মহত্যা ছাড়া ওদের হাতে আর কোনো পথ খোলা নেই।

কামালউদ্দিন কী চরিত্রের লোক ছিল এইসব ঘটনা থেকে আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। সে প্রথমে মহারাজা নন্দকুমার ও হেস্টিংসের মনোমালিন্য কাজে লাগিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাইলো। কাউন্সিলে না গিয়ে নন্দকুমারের কাছে এসে অভিযোগ করলো। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে হেস্টিংসের কাছে অভিযোগ করলো। যদি সে জানতো গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের লোক। সেখানে সে বললো যে তাঁকে ভয় দেখাবার জন্যেই এই অভিযোগের অভিনয়। তাই সে ভালোভাবে সব উল্লেখ করেনি অভিযোগপত্রে। সেখান থেকে মহারাজ নন্দকুমার, জোসেফ ফোকস, রায় রাধাচরণের জন্য অভিযোগের রাস্তা খুলে গেলো। সেখানেও না থেকে হেস্টিংসের নামে জোসেফের কাছে চিঠি। একেবারে পোড় খাওয়া স্বার্থপর

না হলে কেউ এভাবে কাজ করে না।

হেস্টিংস সব বুঝেও কিছু বললেন না। দাবার ঘুঁটির এই বোরেকে দিয়ে যে তাঁর অনেক কাজের সমাধান হতে পারে ততদিনে তিনি বুঝে গেছেন। তবে সুপ্রিম কোর্টে কামালউদ্দিন আবার ভুল বলতে পারে। এটা যেন না হয় তাই নিজের একেবারে খাস লোক উচ্চপদস্থ অফিসার স্যর জন ডি'অয়লি-কে দিয়ে কামালউদ্দিনকে প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে-র বাড়িতে পাঠালেন। একজন সাধারণ চোবদার-কে নিজের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দিলেম ইম্পে। তাকে নিয়ে বসলেন। কীভাবে কী বলতে হবে সমস্ত কিছু নিজে হাতে তালিম দিলেন। কামালউদ্দিনের পক্ষে আর কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করার উপায় থাকলো না। এবার ভুল কাজ কিছু করলে যে তার মতো চোবদারের লাশ গুম করতে দ্বিতীয়বার ভাবনা চিন্তা হবে না সেটা সে ভালোভাবেই জানে।

পরেরদিন বিকালবেলায় সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিরা কামালউদ্দিনকে জেরা করলেন। তার পরের দিন মহারাজা নন্দকুমার, জোসেফ ফোকস, রায় রাধাচরণকেও ডাকা হলো জেরার জন্য। জোসেফ ফোকসের পুত্র ফ্রান্সিস ফোকসকেও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু বিচারপতিরা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে আর এই মামলায় জড়ানো হবে না। কারণ সেরকম কোনো তথ্য প্রমাণ বা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে নেই। ফ্রান্সিস রেহাই পেলেন।

এলাইজা ইম্পে রায় দিলেন,

'এই মুহূর্তে দলিল দস্তাবেজ দেখে মনে হচ্ছে মহারাজা নন্দকুমার, জোসেফ ফোকস এবং রায় রাধাচরণের বিরুদ্ধে হেস্টিংস, ভান্সিটার্ট এবং বারওয়েল মামলা করতে চাইলে করতে

পারেন। চিন্তাভাবনার জন্য তিনদিন দেওয়া হলো।'

রায় দেওয়া হল বটে। কিন্তু জোসেফ ফোকসের কাছে কামালউদ্দিনের দ্বিতীয় চিঠি যে এই কেসকে দুর্বল করে দিয়েছে তা সবাই জানতো। তবু যতটা হেনস্তা করা যায় ততটাই লাভ! এই ভেবে সুপ্রিম কোর্টে এই তিনজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হলো। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে ওঁরা ষড়যন্ত্র করছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির চেয়ারে বসে এলাইজা ইম্পে হাসতে হাসতে সেই মামলা গ্রহণ করলেন।

তবু এই কেসের শুনানি বা বাকবিতণ্ডা কবে হবে তা কিছু স্থির হলো না। হেস্টিংস আনতেন এই ঠুনকো কেসে আর কিছুই করার নেই। এবার অন্যকিছু ভাবতে হবে। ঠিক এরকমই এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে মোহনদাসের সঙ্গে পরিচয় হল।

এই ঘটনার ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ১৭৭৫ সালের ৫ মে নিজের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার হলেন মহারাজা নন্দকুমার। শত চেষ্টা করেও তিনি জামিন পেলেন না। জামিন অযোগ্য কী কাজ করেছেম সেটা ভেবে সকলেই চিন্তায় পড়লো। মহারাজ শুরুতে নিজেও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি নিজের সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

মহারাজ মহারাজকীয়ভাবে তাঁর চিন্তাভাবনা সাজালেন।



কারাগারে মহারাজ নন্দকুমার এক আশ্চর্য স্থিতধী প্রজ্ঞার প্রমাণ দিলেন। জাগতিক কোনো বিষয়েই তাঁর বিশেষ হেলদোল দেখা যায় না। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাই যে তাঁর কাল হয়েছে সেটা সকলেই বুঝতে পারছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীর তালিকা দিন দিন বড় হতে লাগল। হেস্টিংসে সাহায্য করতে ইম্পে, বারওয়েল, কান্ত পোদ্দার প্রভৃতি তো ছিলোই এবার মোহনদাস, রাজা রাজবল্লভ, ভান্সিটার্ট, গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি উঠেপড়ে লাগলো। যেন তেন প্রকারেই হোক এবার মহারাজা নন্দকুমার-কে শায়েস্তা করত্র হবে।

মহারাজা নন্দকুমার এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারাগারে থাকা তাঁর কাছে ঘৃণার বিষয় ছিল। কারাগারে গেলে পাপ হয়। জাতি যায়, ধর্ম যায়— এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কাজেই এই কারাগারে তিনি আহার করতে রাজি হলেন না। শুরুতে এই ঘটনা ছোট হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটাই একটা বড় আকার ধারণ করতে লাগল।

এভাবে তিনদিন কেটে গেলো। শারীরিক অসুস্থতা আসতে শুরু করলো। সুপ্রিম কোর্টের নিকট তিনি স্বতন্ত্র ভোজনের জন্য দরখাস্ত অবধি করলেন।

স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস এই অন্যায় আচরণে কষ্ট পেলেন। তিনিও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের জানালেন,

—মহারাজ নন্দকুমার অতি উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ। তিনি কারাগারে আহার করবেন না। সুতরাং তাঁকে যদি কারাগারেই রাখতে হয় তবে তাঁর জন্য আহারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত।

এই অনুরোধ ফ্রান্সিস সাহেব করেছিলেন দ্বিতীয়দিন। তারপর আরও দুইদিন কেটে গেল। কোনো উপায় বেরোলো না।

এইসময় দুইজন ইংরেজ রমণী মহারাজা নন্দকুমারের সঙ্গে কারাগারে দেখা করতে আসেন। একজন ছিলেন ক্লেভারিং সাহেবের কন্যা, অন্যজন মনসন সাহেবের সহধর্মিণী। ওঁরা দু'জনেই তাঁকে জীবনমুখী হবার নানান পরামর্শ দিলেন। তাঁকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন।

মহারাজা নন্দকুমার তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন,

—আপনারা এসেছেন। এই মানব জীবন ধন্য। বিদেশি শাসকদের স্ত্রী রত্ন এক দেশীয় ব্রাহ্মণের শোকে কাতর! এ এক অভিনব পরিস্থিতি। আমি জীবনবিমুখ হবো না কথা দিলাম। কিন্তু আমার কুলের সম্মান বজায় রাখা, আমার পূর্বপুরুষদের পরলোকে এই মুখ দেখাতে পারা থেকে বঞ্চিত হবার ভয় আমার আছে। কারাগারে আমি আহার গ্রহণ করবো না। আমায় এই অনুরোধ করবেন না।

দু'জনেই বিফল মনোরথে ফিরে এলেন।

অনেক পরামর্শের পর বিচারপতিরা কারাগারে ব্রাহ্মণের আহার করা সম্পর্কে মতামত জানার উদ্দেশ্যে কয়েকজন পণ্ডিতকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পাওয়ামাত্র কান্ত পোদ্দার উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি এক বেলার মধ্যে কিছু ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণকে হাজির করলেন কোর্টে। সকলেই তাঁর পরিচিত। তাদের কাছ থেকে নিজেদের সুবিধে মতো নির্দেশ বের করা একদমই কঠিন কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণরা নির্দেশ দিলেন,

—কারাগারে আহার করলে পতিত হবার কোনো ভয় নেই। বিশেষত রাজপুরুষের আদেশ পালনে কোনোরূপ পাপ হয় না। রাজদণ্ড ভোগের পর সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই সমস্ত পাপের খণ্ডন হয়।

এই রায়ে মহারাজা নন্দকুমার অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি আবার নিরপেক্ষ ব্রাহ্মণ চয়ন করার জন্য দরখাস্ত দিলেন। এবার অবস্থা বেগতিক দেখে একজন নিরপেক্ষ শাস্ত্রজ্ঞের সন্ধান চললো। সন্ধানে একজনকে পাওয়াও গেল। তিনি বিধান দিলেন,

—কারাগারে অন্নগ্রহণ করলে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবমাননা হয়। পাপ হয়। সেই ব্যক্তি পতিত হয়।

এবার বিচারকগণ আর দেরি না করে স্বতন্ত্র আহারে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। কারণ তাতে দৃষ্টি আসল ঘটনা থেকে অন্যকিছুর দিকে ঘুরে যাচ্ছিলো।

কারাগারে একটি স্বতন্ত্র তাঁবুর ব্যবস্থা করা হলো। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণের সহায়তায় আহারাদি সারতে লাগলেন।

প্রথমদিন থেকে যে দরবার শুরু হয়েছিল কারাগারে সেটা অব্যাহত ছিল। আহার না কতেও এতোদিন তিনি দরবার করতেন। বহু লোক এসে সেখানে সাক্ষাৎ করতো। বহু ফয়সালা সেই কারাগারের বদ্ধ দুয়ারের পিছনেই হয়েছিল। বাদি-বিবাদি সবাই নন্দকুমারের রায় মেনে নিতো।

এরকমই একদিন দুপুরবেলায় বাদি-বিবাদি সবাই ফিরে গেছে। মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে তাঁবুতে বসে আছে নন্দকুমার। বাইরে পাহারাদার অপেক্ষা করছে। কোর্টে তাঁকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেছে। সেসব বিষয়ে সন্ধের আগে কোনো খোঁজ পাবার উপায় নেই।

এই ভরদুপুরে একা একা বসে বুলোকি দাসের কথা নন্দকুমারের খুব মনে পড়ছে। আজ তিনি বেঁচে নেই। অথচ আজ তিনি বেঁচে থাকলে তাঁকে কারাগারে রাখার সাহস কারো হতো না।

প্রায় পনেরো বছর আগের কথা। বুলোকি দাস শেঠ ছিলেন হিন্দুস্থানি আগরওয়ালা। তখন মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান। রাই বুলোকি দাস ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ আসেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি সদয় ছিল। অল্প সময়েই তাঁর নাম সকলে জানতে পারলেন।

মহারাজ নন্দকুমার তখন মির জাফরের দেওয়ান ছিলেন। ফলে তিনিও মুর্শিদাবাদেই থাকতেন। প্রথমে সৌজন্য সাক্ষাৎ ইত্যাদি হলেও ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। পরবর্তীকালে তিনি ব্যবসায় এতোটাই উন্নতি করলেন যে স্বয়ং নবাব মির কাশিমের পোদ্দার পদে উন্নীত হলেন। এমনকি নবাবের সঙ্গে অব্দি তাঁর লেনদেন চলতো সরাসরি। শুধু যে মুর্শিদাবাদে ব্যবসা চলতো তা নয়। ঢাকাসহ বহু জেলাতেই তাঁর ব্যবসা ছিল। বাংলার বাইরে কাশীতেও চলতো তাঁর ব্যবসা। তাঁর বহু কর্মচারী এইসব অঞ্চলে নিযুক্ত ছিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

বুলোকি দাস নন্দকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। আপদে বিপদে নন্দকুমারের পরামর্শ ছাড়া

কোনো কাজ করতেন না। ব্যবসাই হলেও ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন এই বুলোকি দাস। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভীরু হয়ে পড়েন। এই একটা জায়গায় নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর নিজের একটা মিল খুঁজে পাওয়া গেলো।

নন্দকুমারের এক গুরুদেব ছিলেন। সেই গুরুকেই তিনি তাঁর সমস্ত ধ্যান জ্ঞান বলে মনে করতেন। তাঁর নির্দেশ ভিন্ন কোনো বড় কাজ করতে চাইতেন না। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে হুগলি জেলার ফৌজদার নিযুক্ত হবার পর থেকে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর আর কোনো দেখা হয়নি। গুরুপত্নীকে তিনি মায়ের মতো ভালোবাসতেন। গুরুদেবের একমাত্র কন্যাকে নিজের বোনের মতো স্নেহ করতেন। টান সাত-আট বছর ধরে তাঁদের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তাঁর তখন যথেষ্টই অর্থ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি হয়েছে। তিনি ভাবলেন গুরুর বাড়ি গিয়ে গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাকে বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার দেবেন। সেই উদ্দেশে তিনি একটা কল্কা, একটা মুক্তোর হার, একটা শিরপ্যাঁচ এবং চারটি হীরের আংটি নিয়ে গুরুর বাড়িতে রওয়ানা হলেন।

গুরুদেবের বাড়ি পৌঁছে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তিনি সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন গুরুপত্নী দেহত্যাগ করেছেন। গুরুকন্যা ইতিমধ্যেই বিধবা। তাঁর বুক ফেটে গেলো এই খবরে। তিনি গুরুদেবকে প্রণাম করে বিষণ্ন মনে ফিরে এলেন।

ফেরার পর তিনি ভাবতে লাগলেন এই অলঙ্কারগুলো দিয়ে কী করবেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই অলঙ্কার তিনি তার কাছে রাখবেন না। তাঁর বন্ধু বুলোকি দাসের কাছে অলঙ্কার পাঠিয়ে দেবার মনস্থ করলেন। গুরুকন্যাই এই অলঙ্কারের প্রকৃত

অধিকারিণী। সুতরাং তাঁর যখন টাকার দরকার হবে এই গয়নার বদলে তাঁকে টাকা দেওয়া হবে। এইসব চিন্তা করে তিনি বুলোকি দাসের কাছে গেলেন। সেই অলঙ্কার তিনি গচ্ছিত রাখতে সম্মত হলেন। অলঙ্কার বিক্রি করে সেই বিক্রির টাকা সুদে খাটিয়ে বৃদ্ধি করার উপায় নিয়েও আলোচনা হলো।

এরপর মির কাশিমের সঙ্গে যখন ইংরেজদের বিরোধ হল তখন বক্সারের যুদ্ধ শুরু হলো। বুলোকি দাস তখন মির কাশিমের সঙ্গেই ছিলেন। মির কাশিম যুদ্ধে পরাজিত হলে পালিয়ে গেলেন। বুলোকি দাস ফিরে এলেন। তিনি মির কাশিমের অনুগত ছিলেন বলে তাঁর উপর ইংরেজ সরকার নানাবিধ অত্যাচার করতে লাগলো। এমনকী তাঁর সঙ্গে তাঁর হিসাবরক্ষক কৃষ্ণজীবনকেও বন্দি করলো।

সেই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ঢাকায়। তিনি কোম্পানির প্রধান কর্মচারী। তাঁর সঙ্গে বুলোকি দাসের বনিবনা ভালো ছিল না। রেজা খাঁ প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেলেন। মির কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই তিনি বুলোকি দাসের ঢাকার কারবার ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। মুর্শিদাবাদেরও ব্যবসারও একই গতি হল। মির কাশিমের সঙ্গে থাকা বুলোকি দাসের সর্বনাশ ডেকে আনলো।

এক মাসের অধিক সময় নজরবন্দি থাকার পর বুলোকি দাসকে মুক্তি দেওয়া হল। তিনি বারাণসীতে পালিয়ে গেলেন। অপরাধীর মতো লুকিয়ে জীবন কাটাতে লাগলেন। কলকাতা আসার সাহস তিনি পেলেন না। কিন্তু বাংলাদেশে ফেরার জন্য তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

বুলোকি দাস শ্যামলাল নামে একজন লোককে কলকাতার

কালেক্টর গ্রে-সাহেবের কাছে পাঠালেন। তিনি বাংলাদেশে ফেরার অনুমতি চাইলেন। গ্রে-সাহেব অনুমতি দিলেন। কিন্তু এতে লর্ড ক্লাইভ ভয়ানক চটে গেলেন। গ্রে সাহেব তাঁর অনুমতিপত্র ফিরিয়ে নিলেন। তবু গ্রে-সাহেবকে চাকরি ছেড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হলো।

ক্লাইভের চটে যাবার কারণ ছিল অন্য। বুলোকি দাস কোম্পানির কাছে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পেতেন। বাংলাদেশে ফিরে এলে সেই টাকা তিনি কোম্পানির কাছে দাবি করবেন। বুলোকি দাসকে বাংলাদেশে ঢুকতে না দিলে সেই টাকা আত্মসাৎ করা যায়।

পরবর্তীকালে বুলোকি দাসকে অবশ্য আর আটকে রাখা গেল না। ক্লাইভের পূর্ববর্তী গভর্নর স্পেনসার সাহেবের থেকে অনুমতি নিলেন বুলোকি দাস। ক্লাইভ আর আপত্তি দেখাতে না পেরে নিজেই তার আসার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে বুলোকি দাসের হাতে ক্লাইভের চিঠি এসে পৌঁছালো।

'সুধী বুলোকি দাস'
আপনি ফিরে আসুন। বাংলাদেশে ফিরে এলে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।
ধন্যবাদান্তে
'রবার্ট ক্লাইভ।'

বুলোকি দাস কলকাতায় ফিরে বুঝলেন তাঁর হাতে আর বেশি সময় নেই। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইত্যাদি লুঠ ও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। তার মধ্যে ছিল মহারাজ নন্দকুমারের গচ্ছিত অলঙ্কার। বিক্রির আগেই বক্সারের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর আর তিনি এসব বিষয়ী কাজ করে উঠতে পারেননি। ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁর

কাছে আর কোনো টাকা অবশিষ্ট ছিল না। ফলে তিনি মহারাজা নন্দকুমারকে মৃত্যুর কিছুদিন আগে ডেকে পাঠালেন।

মহারাজ নন্দকুমার এসে দেখলেন তাঁর বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। বয়স ও অপমানের ভারে ন্যুজ এক বৃদ্ধকে তিনি আবিষ্কার করলেন। আগের উৎফুল্ল প্রাণোচ্ছল শেঠ বুলোকি দাস আর কোথাও অবশিষ্ট নেই।

—বসুন।

বুলোকি দাস ক্ষীণ গলায় তাঁকে আহ্বান করলেন। তারপর নিজে উঠে বসার চেষ্টা করলেন।

—আরে করছেন কী? আপনি শুয়ে থাকুন।

তবু বুলোকি দাস উঠে বসবেন। নন্দকুমার সাহায্য করলেন।

—বন্ধু, আর তো বেশি সময় নেই। আমার স্ত্রী, কন্যা এবং পালিত পুত্র পদ্মমোহনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাকে নিতে হবে।

মহারাজ নন্দকুমার বললেন,

—বেশ। আপনি চিন্তা করবেন না।

বুলোকি দাস কিছু দলিল দস্তাবেজ দিলেন।

—আমি কোম্পানির কাছে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা পাওনা আছি। এই মর্মে একটি করারনামা আপনাকে লিখে দিচ্ছি। এতে লেখা আছে—

'কোম্পানির কাছে আমার দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার (২,৩০,০০০) টাকা পাওনা আছে। আপনি যদি সেই টাকা সুদ সমেত আদায় করতে পারেন তাহলে গভর্নর সাহেব, মিস্টার বাউটন এবং মিস্টার পিয়ার্সনকে তার অর্ধেক দেবো। যদি তাঁরা এই টাকা নিতে রাজি না হন তাহলে ওই টাকার অর্ধেক (মোট টাকার এক





চতুর্থাংশ) আপনাকে দেবো। আপনার অলঙ্কার বাবদ প্রদত্ত চিঠিতে উল্লেখ্য সুদের সবটা আমি দিতে পারবো না।। তার মাত্র এক চুতর্থাংশ দেবো। যদি কোম্পানির কাছ থেকে সুদ আদায় করতে না পারেন, শুধু আসল দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকাই আদায় হয়, তাহলেও আমি গভর্নর সাহেব ও পিয়ার্সন সাহেবকে এক লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য থাকবো। যদি তাঁরা সেই টাকা গ্রহণ না করেন তবে ওই এক লক্ষ টাকার অর্ধেক আপনাকে দেবো। গভর্নর সাহেবরা ঐ টাকা গ্রহণ করবেন বলে আমার কাছে কথা দিয়েছিলেন। আপনি তাঁকে জানাবেন তাঁর এই টাকা গ্রহণের কথা কেউ কখনো জানতে পারবে না।

'আর আপনার অলঙ্কার মূল্য হিসাব বাবদ আপনাকে আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকার (৪৮,০২১) একটি দলিল লিখে দিচ্ছি। এই দলিল প্রমাণ করবে যে আপনি আমার থেকে এই টাকা পাওনা রয়েছেন।'

মহারাজ নন্দকুমার সেই দলিল এবং করারনামা গ্রহণ করলেন এবং এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। মৃত্যুশয্যায় থাকা বন্ধুর কথা রাজি না হয়ে তাঁর কাছে অন্য কোনো উপায়ও ছিল না।

বুলোকি দাস ৪৮,০২১ টাকার দলিল বা চিঠি দেবার সময় ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে সেই চিঠি তাঁর প্রিয় বন্ধু নন্দকুমারের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে তিনি হয়তো কখনোই এই কাজ করতেন না। এই চিঠি জাল করার অভিযোগেই আজ নন্দকুমার কারাগারে বন্দি।



বুলোকি দাসের সমস্ত সম্পত্তির দুইজন আমমোক্তার ছিল। একজন তাঁর পালিত পুত্র পদ্মমোহন। আরেকজন মোহন প্রসাদ। এই জাল অভিযোগে মোহনপ্রসাদ ছিলো ফরিয়াদী। মহারাজ নন্দকুমারের নামে যে অভিযোগপত্র সে জমা দিয়েছিল তাতে লেখা ছিল—

'আমার নাম মোহনপ্রসাদ। আমি বুলোকি দাসের অছি (ওয়ারিশ)। গঙ্গাবিষ্ণু ও হিঙ্গুলালের আমমোক্তার। ১৭৬৯ সালে বুলোকি দাসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু আগে তিনি একটি দানপত্র তৈরি করেন। সেই দানপত্র অনুযায়ী তাঁর পালিতপুত্র পদ্মমোহন তাঁর সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পেয়েছেন। তিনি পদ্মমোহন ও আমাকে তাঁর সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করে গেছেন। প্রায় তিন বছর হলো পদ্মমোহন মারা গেছেন। এখন আমিই মৃত বুলোকি দাসের সম্পত্তির দেনা পাওনার হিসেবপত্র রাখি। আদায় উশুলও আমিই করি। আদায়ের উপর শতকরা পাঁচ টাকা আমি তহরী পেয়ে থাকি।'

মহারাজা নন্দকুমার বুলোকি দাসের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ি এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পদ্মমোহনের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার গ্রহণ করতে বুলোকি দাস নন্দকুমারকে অনুরোধ করেছিলেন। নন্দকুমার তাঁর কাছে কিছু টাকা পেতেন। বুলোকি

দাস তাঁর কোম্পানির চিঠির বিনিময়ে নন্দকুমারকে সেই টাকা আদায় করতে অনুরোধ করেন। গঙ্গাবিষ্ণু ও পদ্মমোহনকে নিয়ে নন্দকুমার হেস্টিংসের দপ্তরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বুলোকি দাসের কাগজপত্র উদ্ধার করে এনে নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন।

বুলোকি দাস প্রদত্ত আমমোক্তারনামায় নন্দকুমার দশ হাজার টাকা পান বলে উল্লেখ আছে। গঙ্গাবিষ্ণু-কে সেটা আমি দেখাই। কয়েকদিন পর গঙ্গাবিষ্ণু আমাকে ও পদ্মমোহনকে নিয়ে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে ফেলার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের কাছে গেলেন। নন্দকুমার বুলোকি দাসের লেখা বলে তিনটি চিঠির উপরের অংশ ছিঁড়ে পদ্মমোহনের হাতে দিলেন। সেই তিনটে চিঠির হিসেবে পাওনা বাবদ বুলোকি দাসের সতেরোটা কোম্পানির চিঠির থেকে আটটা চিঠি নিজের কাছে রাখলেন। ঐ তিনটে চিঠির মধ্যে একটায় বুলোকিদাসের ৪৮,০২১ টাকা দেনার কথা লেখা ছিল। মহারাজ নন্দকুমার বলেছিলেন যে তাঁর কাছে গচ্ছিত অলঙ্কারের মূল্য বাবদ বুলোকি দাস তাঁকে এই চিঠি দিয়েছিলেন। এই চিঠি ফারসি ভাষায় লেখা। আমি নিজে ফারসি জানি না। তবুও এই চিঠি একটি জাল বলে আমার সন্দেহ হলো। এই সমস্ত চিঠি, বুলোকি দাসের সম্পত্তির অন্যান্য কাগজপত্র প্রোবেট নেওয়ার সময় মেয়র কোর্টে দাখিল করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে চিঠিগুলো মেয়র কোর্টেই ছিল। কিন্তু চিঠিগুলোর একটা করে নকল আমার কাছে ছিল।

কামালউদ্দিন আলি খাঁ-র কাছে বুলোকি দাসের সম্পত্তির তরফ থেকে কিছু টাকা পাওনা ছিল। মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে হিসাব পরিষ্কার করার কয়েকদিন পর আমি কামালউদ্দিনের কাছে

পাওনা টাকা চাইলাম। কামালউদ্দিন আমার বাড়িতে এসে বলল যে মাত্র ছয়শো টাকা তার কাছে পাওনা আছে। কিন্তু তার যেহেতু আর্থিক অবস্থা ভালো নয় তাই সে সেই দেনা শোধ দিতে পারবে না। সেই সময়েই তাকে মহারাজ নন্দকুমারের ফেরত দেওয়া চিঠিগুলোর নকল তাকে দেখাই। কামালউদ্দিন সেই তিনটে চিঠির নকল পাঠ করে ৪৮,২০১ টাকার চিঠিটা আমাকে দেখায়। দেখিয়ে বলে যে এই চিঠির সাক্ষীর নামের জায়গায় তার নাম রয়েছে। কিন্তু এরকম কোনো চিঠিতে সে সাক্ষী হয়নি। তার কাছে এই কথা শুনে চিঠির জাল হওয়া নিয়ে আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে কামালউদ্দিন আমার কাছে আবার আসে। তখন বললো যে মহারাজ নন্দকুমার তার লবণের ইজারা নেওয়ার সময় জামিন হিসেবে ছিলেন। এখন তিনি বলছেন যে তাঁর কথামতো কাজ না করলে তিনি আর জামিন থাকবেন না। তিনি নাকি তাকে তিনটি কাজ করার শর্ত দিয়েছেন। প্রথম শর্ত হলো বুলোকি দাসের বিরুদ্ধে যে তিনি একটি ৪৮, ০২১ টাকার চিঠি জাল করেছেন সেই চিঠি আসল বলে প্রমাণ করতে আমাকে সাক্ষী দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, হেস্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করতে হবে। তৃতীয় কাজ, বসন্ত রায়ের বিরুদ্ধেও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করতে হবে। কিন্তু কামালউদ্দিন আলি খাঁ-র মতো ধর্মপরায়ণ লোকের পক্ষে এরকম হীন কাজ সম্ভব নয়। সে এই প্রস্তাবে রাজি হলো না। সুতরাং তাঁর এখন লবণের ইজারার জন্য একজন জামিন দরকার। সেই জামিন সংগ্রহ করে দিতে সে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছে।

কামালউদ্দিনের এই কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

এরপর কাছারি কোর্টে বুলোকি দাসের কোম্পানির চিঠির টাকার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের নামে নালিশ করলাম। সেই মোকদ্দমায় নন্দকুমার তাঁর জবাবে বললেন যে, তিনি বুলোকি দাসের কাছ থেকে তিনটে চিঠির টাকা পেতেন। সেই তিনটা দলিল কোম্পানির দলিলে মূল্য বাবদ তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাছারি আদালতে আমার অভিযোগ বাতিল হবার উপক্রম হলো। তখন আমরা সালিশ মানবো বলে ঠিক করি। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নালিশ হয়নি।

এই নতুন সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হবার পর মেয়র কোর্টের সমস্ত দলিল-পত্র-চিঠি সব সুপ্রিম কোর্টে এসেছে। আমি সুপ্রিম কোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের নামে অভিযোগ করছি যে ৪৮,০২১ টাকার দলিলটি জাল করেছেন তিনি। মহারাজ নন্দকুমারকে তাঁর গচ্ছিত অলঙ্কার বাবদ কোনো চিঠি বা দলিল বুলোকি দাস দেননি। সুতরাং এই চিঠি তিনি জাল করেছেন। এটাই আমার অভিযোগ।'

এলাইজা ইম্পের কাছে এই অভিযোগ উপস্থিত হলো। যাতে এই অভিযোগ গৃহীত হয় তাই কামালউদ্দীন এই এজাহার সমর্থ করতে বিচারালয়ে উপস্থিত হল। সে বলল,

—আমি লক্ষ করেছি ৪৮,০২১ টাকার দলিলে আমার নাম ও আমার নামের ছাপ রয়েছে। মহারাজ নন্দকুমার আমার নাম জাল করেছেন। এই কথা তিনি গোপনে আমার কাছে স্বীকারও করেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা মোহনপ্রসাদের অভিযোগ পত্র সানন্দে গ্রহণ করলেন। তখনই প্রথমবার বোঝা গেলো কেন মহারাজ নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারির পরোয়ানায় বিচারপতিদের হস্তাক্ষর ছিল।

গ্রেপ্তারির দু'দিন পর মহারাজ নন্দকুমার কারাগার থেকে কাউন্সিলের কাছে একটা চিঠি লিখলেন। তার মর্মার্থ ছিল এরকম,

'মাননীয় কাউন্সিল'

নবাব মির জাফরের সময়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ও ইংরেজদের বিশেষ বন্ধু, দেওয়ানের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত পুত্রের পিতা নন্দকুমার আজ সাধারণ এক কারাগার থেকে আপনাদের চিঠি লিখছেন। এই ঘটনায় হয়তো আপনারা আজ অবাক হবেন। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস আমাকে যে ভয় দেখাচ্ছিলেন তা আমি আগের চিঠিতে আপনাদের জানিয়েছিলাম। যেখানে স্বয়ং শাসনকর্তা কারো সর্বনাশ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন সেখানে সেই ব্যক্তির শত্রুরাও তার সর্বনাশ করার কোনো সুযোগ ছাড়বে না তা বলাই বাহুল্য। শাসনকর্তাদের মনতুষ্টি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য সর্বসাধারণের কাছে হীন চরিত্রের লোক বলে কুখ্যাত ব্যক্তিও নানারকম মিথ্যে অভিযোগ করেছেন আমার নামে। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি যা ন্যায় তাই করেছি এবং যা সত্য তাই বলেছি। আমার শত্রুরা তাই আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে এবং আমার অনিষ্ট সাধন করতে চাইছে। আমি বাংলাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ পদের অধিকারীকে চোর বলেছি। তিনি নিজে নির্দোষ এটা প্রমাণ না করে আমাকে দুশ্চরিত্র প্রমাণ করতে বেশি সময় খরচ করছেন। আমি আগে আপনাদের কাছে চিঠিতে গভর্নর জেনারেলের রোষ এবং আমার শত্রুদের সম্পর্কে জানিয়েছিলাম সেটাই এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমি যেন আসামী প্রমাণিত

না হই। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো। এই মিথ্যা অভিযোগে আমার মৃত্যুদণ্ড দিতে যে সাক্ষীর অভাব হবে না তা আমি ভালোভাবেই জানি।

আর কারাগারে থেকে একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে তাঁর দৈনন্দিন কর্ম করাও কঠিন। তা বিবেচনা করবেন।

বিনয়াবনত

'মহারাজ নন্দকুমার।'

এই চিঠি স্যর ফ্রান্সিসসহ অন্যরা পাঠ করলেন। মনসন প্রস্তাব করলেন যে,

—নন্দকুমারকে যে শমন জারি করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রা কাউন্সিলে দেখানো হোক।

হেস্টিংস বললেন,

—আমার এই প্রস্তাবে আপত্তি আছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের ক্ষমতাবলে যা করেছেন কাউন্সিল তাতে হস্তক্ষেও করতে পারে না। এটা করার চেষ্টা করলে আমি বাধা দেবো।

নন্দকুমারকে একেবারে সাধারণ কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। এটা সমনে লেখা আছে কি না তা জানার জন্যই মনসন সাহেব এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আর সেই সমনে সাধারণ কারাগারের কথা লেখা ছিল না বলেই হেস্টিংস পত্রপাঠ এই প্রস্তাব খারিজ করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও অধিকাংশের সিদ্ধান্তে এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলো।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি লেমেইস্টার ও হাইড কাউন্সিলকে এর উত্তরে লিখলেন,

—যদি কাউন্সিলের কোনো সভ্য তাঁদের নামে মিথ্যা

দোষারোপ করেন কিংবা মিথ্যা কোনো অপবাদ দেন তাহলে তাঁর উপর ইংল্যান্ডের কঠোরতম আইন প্রয়োগ করা হবে।

এরপর কাউন্সিলের আর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। সকলে নিরস্ত হলেন।

৮ মের ঘটনা এটা। কাউন্সিল এরপর থেকে আর কোনোরূপ হস্তক্ষেপও করলো না। এর দশদিন হেস্টিংস তাঁর এজেন্ট গ্রাহাম ও ম্যাকলিন সাহেবকে পত্র মারফত লিখছেন,

—বৃদ্ধ নানকুমারের ফাঁসি হবে এটা একপ্রকার নিশ্চিত।

হেস্টিংস জানতেন তাঁর বাল্যবন্ধু এলাইজা ইম্পে এই কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন। তাই বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগে থেকেই নন্দকুমারের সাজা নিয়ে বিরোধীপক্ষ একপ্রকার সকলেই নিশ্চিত ছিল।

এখানে উল্লেখ্য, নন্দকুমারের বিপক্ষে অভিযোগের মূল অস্ত্রই ছিল অলঙ্কারের বাবদ প্রদত্ত দলিল। বুলোকি দাস সেই দলিলে তিনজন সাক্ষীর হস্তাক্ষর নিয়েছিলেন। মহতাব রায়, শীলাবৎ এবং আব্দুল কামাল মহম্মদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই অভিযোগের সময়কালে ওঁদের কেউ জীবিত ছিলেন না। এটা আপার অসম্ভব মনে হলেও এটাই ঘটনা। কারণ এই দলিল প্রাপ্তির পর বহু বহু বছর কেটে গেছে। নেহাত নন্দকুমারকে ফাঁসানোর জন্য এই দলিল পুনরুত্থাপিত করা হয়েছিল।

ফরিয়াদী পক্ষ জানালো যে শীলাবৎ জীবিত নন, মহতাব রায় বলে কেউ আদতেই ছিল না। আর মোক্ষম চাল ছিল—আবদুল কামাল মহম্মদ-ই হচ্ছেন কামালউদ্দিন আলি খাঁ।

এই সমস্ত ব্যাপারটাই সকলের কাছে একটা রহস্য বলে মনে হতে থাকল। চারদিকে একটা শোরগোল বেধে গেল। কিন্তু

হেস্টিংসের একমুখী চিন্তাভাবনা এবং শক্তিকে সবাই সমীহ করতে শুরু করলেন।

এরই মধ্যে ফ্যারার এবং ব্রিকস নামে দুই আইনজ্ঞ ইংরেজ মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করলেন। ফ্যারার এই মোকদ্দমার প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি নন্দকুমারের পক্ষ বারবার নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ডিগ্রি।

এই মামলা যখন সুপ্রিম কোর্টে চলছে তখনও তিনি পাশ করা ব্যারিস্টার ছিলেন না।

অদৃষ্ট এবার সবরকমভাবে মহারাজ নন্দকুমারের বিপক্ষে ছিলো। তিনি ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছিলেন। কুঁকড়ে যাচ্ছিলেন এক জাঁদরেল প্রাক্তন মন্ত্রী।



হেস্টিংসের ইচ্ছা ছিল গ্রেপ্তারির দশদিনের মাথাতেই সমস্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করে নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাঁকেও বিভিন্ন কারণে ধৈর্য ধরতে হচ্ছিল। তারপর একদিন উপস্থিত হলো সেই দিন যখন বিচারকার্য অফিসিয়ালি শুরু হল।

১৭৭৫ সালের ৩ জুন বিচার আরম্ভ হলো। সুপ্রিম কোর্টের বাইরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। এক এক করে আসতে লাগলেন প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে জুরি মেম্বাররা।

মির জাফরের সময়ের প্রধানমন্ত্রী, নতুন নবাবের দেওয়ানের পিতা, বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রভূতশালী, নির্ভীক, তেজস্বী বাঙালি ব্রাহ্মণ নন্দকুমারকে শেকল বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে জনগণ আক্রোশে ফেটে পড়লেন। চারদিক থেকে সকলে নন্দকুমারকে একবার ছুঁতে সমস্ত আইনশৃঙ্খলা ভেঙে ফেললেন। কোর্ট চত্বরে তীব্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। সিপাহিরা পরিস্থিতি সামলে গলদঘর্ম হয়ে গেলো। হেস্টিংস এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। এখন যদি বাংলাদেশ একত্রে জেগে ওঠে তাহলে সর্বনাশ হবে। গুটিকতক ইংরেজকে উপড়ে তুলে ফেলে দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগবে মাত্র। দাবার চালে ভুল করলেন না তো?

সুচীসূক্ষ্ম নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘিরে কোনোভাবে মহারাজ নন্দকুমারকে সুপ্রিম কোর্টে ভিতরে ঢোকানো হলো। জনগণ "হায় হায়" স্লোগানে মুখরিত হলো চারদিকে। 'ইংরেজ সরকার নিপাত যাক"-এ গমগম করতে লাগলো কোর্ট চত্বর।

অতিরিক্ত সিপাহি বাহিনী ডাকতে হলো। কুরুক্ষেত্রে পরিণত হলো সুপ্রিম কোর্ট চত্বর।

এলাইজা ইম্পে এই ঘটনা দেখে ঢোক গিললেন। অবস্থা এরকম হবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। জনসাধারণ যে ইংরেজদের উপর এতোটাই ক্ষেপে আছে তা এই প্রথম সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেলো। বাকি বিচারকরাও ভয় পেয়েছিলেন। কোর্টে দরজা জানালা আটকে পাহারা বসিয়ে বিচারকার্য শুরু হলো। বিচারপতিরা লাল রঙের বিশেষ পরিচ্ছদ পরে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস, কান্ত পোদ্দার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সকলে এসে দর্শকাসনে বসলেন। মিস্টার ফ্যারার, রাধাচরণ রায়, চৈতন্যনাথ, ফোকস সাহেব সকলে নন্দকুমারের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্পষ্টতই সুপ্রিম কোর্ট দুইভাগে ভাগ হয়ে গেলো।

জুরিরা একে একে এগিয়ে এলেন। ওঁদের শপথ গ্রহণ হলো। ওঁরা নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

মিস্টার ইলিয়ট নামে এক ইংরেজ যুবককে দো-ভাষী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। মিস্টার ফ্যারার এই বিষয়ে নিয়ে প্রতিবাদ করলেন। ইলিয়টের উপর ফ্যারার বা নন্দকুমার কারো কোনো ভরসা ছিল না। তার কারণ এলেইজা ইম্পের স্নেহধন্য ছিল এই ইলিয়ট। ইম্পের বাড়িতে সে থাকতো। তাকে পুত্রের মতো স্নেহ

করতেন ইম্পে। নন্দকুমারের শত্রুদের সঙ্গে ইলিয়টের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। তাই ইলিয়ট যে দো-ভাষী হিসেবে একেবারের নিরপেক্ষ হবেন না তা বলাই বাহুল্য।

ফ্যারারের প্রতিবাদে এলাইজা ইম্পে বললেন,

—মিস্টার ইলিয়টকেই দো-ভাষী হতে হবে। নানা ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন কেসের ক্ষেত্রে আপনার সারল্য ও নিরপেক্ষতাই প্রমাণ করছে যে আপনি এই কেসের ক্ষেত্রে আদর্শ দো-ভাষী।

ফ্যারার জানালেন,

—ধর্মাবতার মিস্টার ইলিয়ট কেবলমাত্র ফারসি ও হিন্দুস্থানী অল্প আধটু জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি সামান্য।

প্রধান বিচারপতি এলেইজা ইম্পে বললেন,

—অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনো প্রমাণ কি আছে? প্রমাণ না থাকলে আর একবারের জন্যেও আপনি এই কথাটি মুখে আনতে পারবেন না। ওভাররুলড!

ফ্যারার বুঝতে পারলেন এই ব্যপারটা নিয়ে আর কিছু করতে গেলে বাকি কেস চলাকালীন সময়ে প্রধান বিচারপতির কোপে পড়তে হবে। তিনি অবস্থা সামলাতে বললেন,

—মিস্টার ইলিয়ট আমার প্রতিবাদে কিছু যেন মনে না করেন। আসলে আমি আপত্তি করতে চাইনি। আমাকে আপত্তি জানাতে বলা হয়েছিল।

এলিজা ইম্পে জিজ্ঞেস করলেন,

—কে আপনাকে এই কাজ করতে বলেছিল?

ফ্যারার জানালেন,

—আমি এটা প্রকাশ করতে পারবো না। দুঃখিত।

ইম্পে হেসে উড়িয়ে দিলেন অভিযোগ,

—যে অভিযোগে কে করতে বলেছে তার নাম প্রকাশ করা যায় না, সেই অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

তারপর তিনি জুরিদের জিজ্ঞেস করলেন,

—ইলিয়টকে বাদ দিয়ে এই বিচারকার্য চলবে কি? তাহলে আমি এক্ষুনি তাকে নিষ্কৃতি দেবো।

জুরিরা একযোগে জানালেন,

—মিস্টার ইলিয়ট ছাড়া কাজ চলবে না।

প্রধান বিচারপতি খুশি মনে ঘোষণা করলেন,

—মিস্টার ইলিয়টের উপর এটা খুব নির্মম দোষারোপ। তাঁর মতো কৃতিত্বের অধিকারীর উপর এরকম দোষারোপ করা বড়ই অন্যায়।

জুরিগণ জানেন স্যর এলিজা ইম্পে বা হেস্টিংস চটলে বিপদ। তাঁরা এগিয়ে এসে বললেন,

—মিস্টার ইলিয়টের চরিত্র ও ক্ষমতা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং মিস্টার ইলিয়টকে আমরা অনুরোধ করছি তিনি যেন দো-ভাষীর কাজটি নিজের হাতে তুলে নেন।

ইম্পে এবং ইলিয়ট এরকম একটি প্রস্তাবের জন্যই বিষয়টিকে টানছিলেন। প্রস্তাব আসা মাত্র মিস্টার ইলিয়ট বললেন,

—আন্তরিক ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি শপথ করে বলছি যে যা বলবো সমস্তই হবে সত্য। সত্য বই মিথ্যের কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

তারপর প্রশ্ন উঠলো সুপ্রিম কোর্টের এলাকা বিষয়ে।

ফ্যারার বললেন,

—মাই লর্ড, যে দলিলের ভিত্তিতে এই কেসের সূত্রপাত সেই

দলিলের তারিখ ছিল ১৭৬৫ সালের ২০ আগস্ট। কিন্তু সেই সময় মহারাজা নন্দকুমার কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন না। তিনি তখন মুর্শিদাবাদে। সেই বছরে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে দেওয়ানিতে আবার বহাল করতে অস্বীকার করলেন এবং মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতায় থাকতে বললেন। শুধু তাই নয়, তিনি যেন কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র কোথাও না যেতে পারেন সেই দিক স্পষ্ট করতে কলিকাতা ছাড়তে নিষেধাজ্ঞা দিলেন। ফলে তিনি কলিকাতা থেকে গেলেন। আর আইন অনুযায়ী আমাদের সুপ্রিম কোর্টের এলাকা শুধুমাত্র কলিকাতা। কিন্তু যেহেতু এই অভিযোগ্ব সময়কালে তিনি মুর্শিদাবাদ ছিলেন তাই সুপ্রিম কোর্টে এই কেস নথিভুক্ত হওয়া উচিত নয়।

এলাইজা ইম্পে এর প্রেক্ষিতে বললেন,

—সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ ন্যায়াদালত। আমি প্রধান বিচারপতি। সঙ্গে রয়েছেন তিনজন অত্যন্ত সম্মাননীয় বিচারপতি। আমাদের মনে হয়েছে এক এক ঘৃণ্য অপরাধ। অভিযুক্তকে তাই আমরা সুপ্রিম কোর্টেই তার বিচারাধীন করার মনস্থ করেছি। আপনারা কী বলেন?

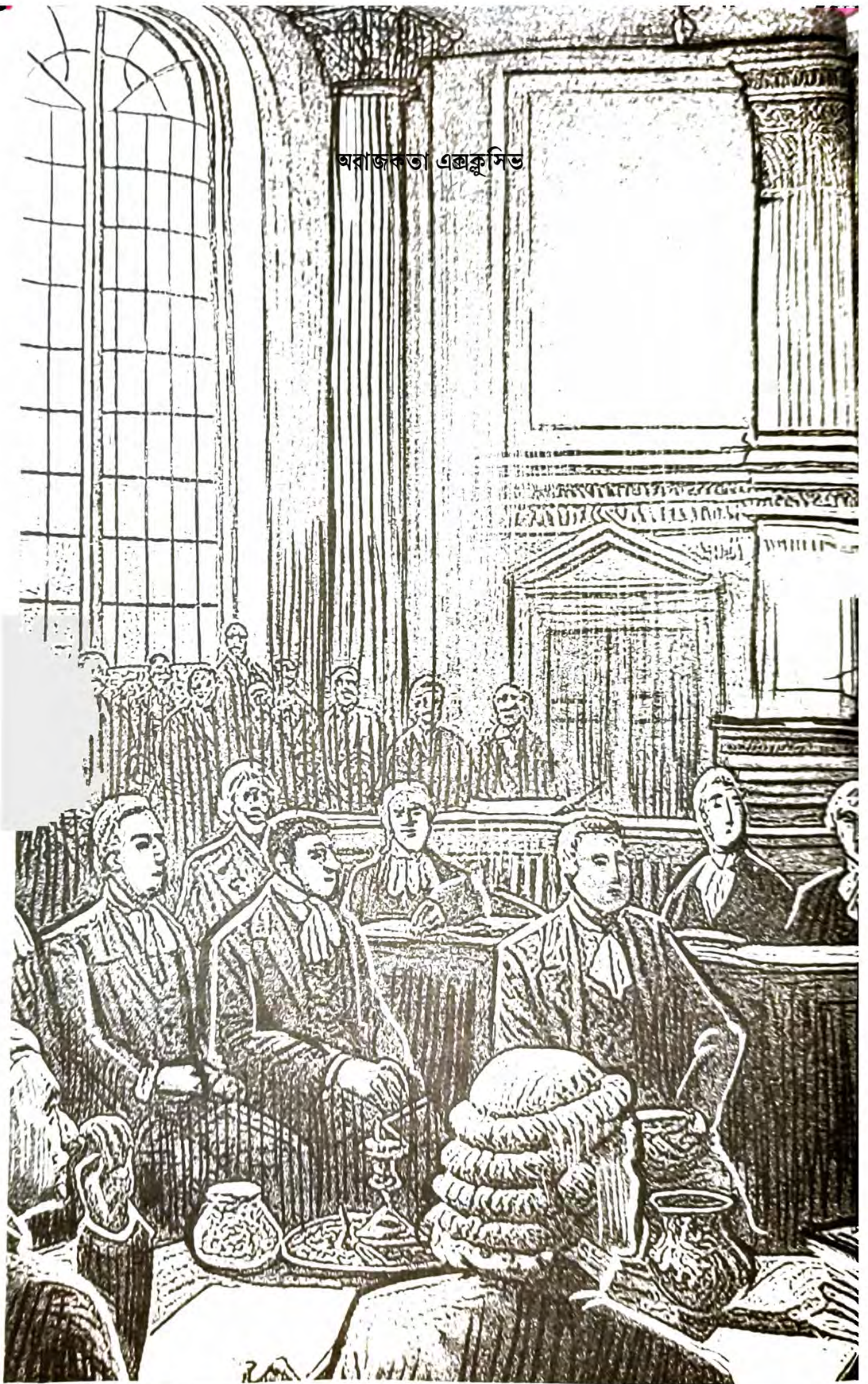
বাকি বিচারপতিরা স্যর এলাইজা ইম্পের সঙ্গে একমত হলেন। ফলে এই তর্কটিও বিনা বাক্য ব্যয়ে শেষ হয়ে গেলো।

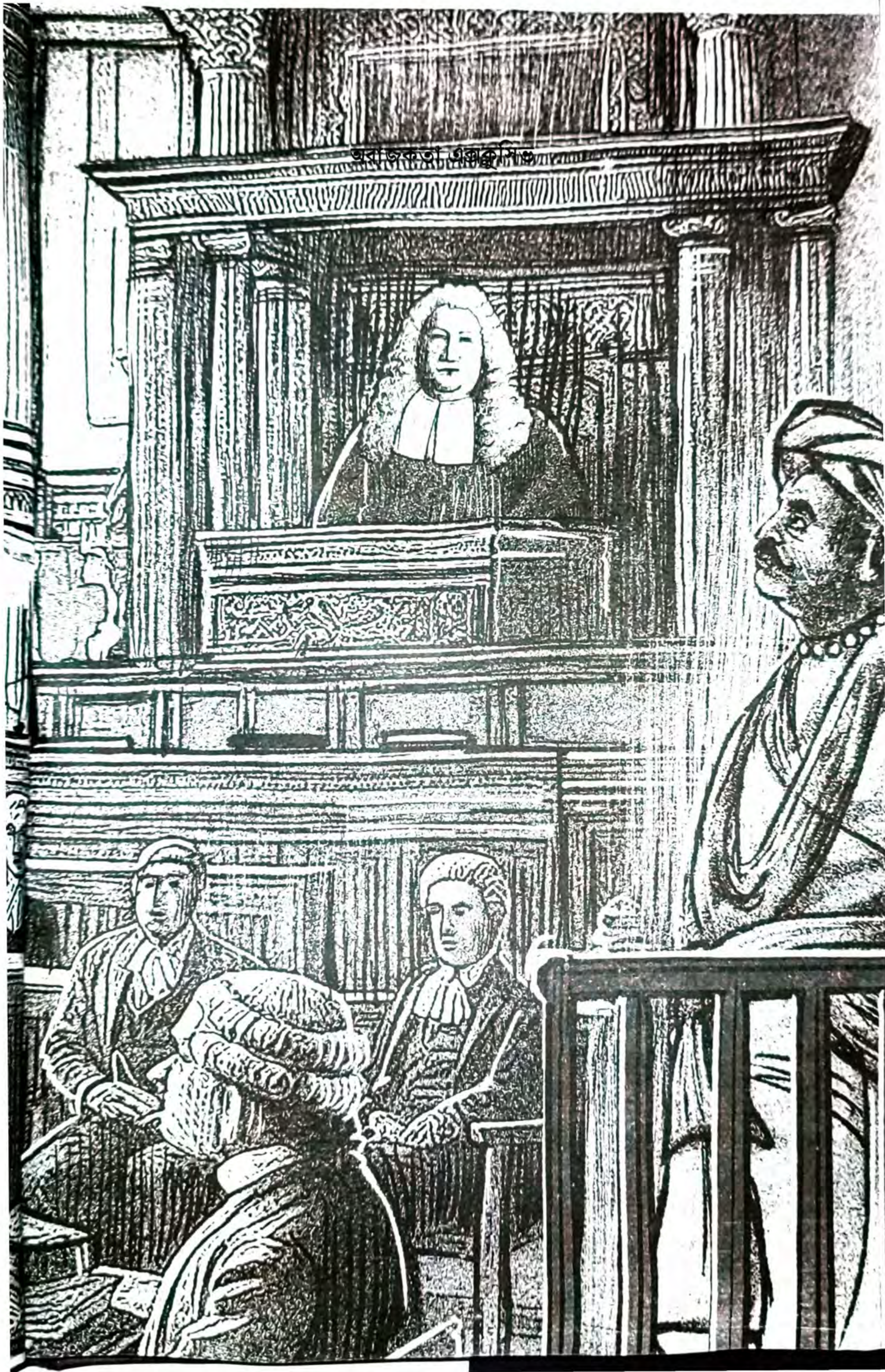
এইবার বিচার শুরু হলো।

ইংল্যান্ডেশ্বর বনাম মহারাজ নন্দকুমার

উপস্থিত বিচারপতিদের নাম—স্যর এলাইজা ইম্পে, স্যর রবার্ট চেম্বার্স, জহান হাইড এবং স্টিফেন সিজার লেমেইস্টার।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে মহারাজ নন্দকুমারের নামে প্রায় কুড়িটি অভিযোগ উপস্থাপন করা হলো। এর মধ্যে রয়েছে—জাল





দলিল প্রস্তুত করা, জাল দলিল ব্যবহার করা, জাল দলিল প্রকাশ করা, জাল দলিল স্পর্শ করা, জাল দলিল অন্যের হাতে অর্পণ করা, জাল দলিল দর্শন করা ইত্যাদি প্রভৃতি। যতভাবে সম্ভব একই কথাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উপস্থাপন করা হলো। অভিযোগগুলো মহারাজা নন্দকুমারকে পড়ে শোনানো হলো।

প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে জিজ্ঞেস করলেন,

—নন্দকুমার, আপনি কি আপনার বিপক্ষে এই সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করছেন?

মহারাজ নন্দকুমার বললেন,

—আমি নির্দোষ।

লেমেইস্টার জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি কার দ্বারা বিচার প্রার্থনা করেন?

মহারাজা নন্দকুমার উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,

—আমি প্রার্থনা করি যে আমার বিচার করুন আমার আরাধ্য ভগবান এবং আমার দেশীয় সমশ্রেণীর কোনো ব্যক্তি।

নন্দকুমারের আর্জি অগ্রাহ্য করা হলো। ইংরেজ এবং ইউরেশিয়ানদের মধ্যে বারোজন জুরি মনোনীত হলেন। এই জুরিদের অনেকের সঙ্গেই নন্দকুমারের অসদ্ভাব ছিল। হেস্টিংসের সঙ্গে বিরোধিতাই এইসব খুচরো শত্রুর জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং এবার শত্রুর অনিষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলেন সকলে। ঢাল তলোয়ার হীন অবস্থায় থাকা শত্রুর চেয়ে অধিক সহজ প্রতিপক্ষ কেই-বা হতে পারে। যে উদ্দেশ্যে এই বিচারসভা সেই উদ্দেশ্য কোনোভাবে যেন ব্যর্থ না হয় তাই জুরি নির্বাচন সেভাবেই করা হলো।

জুরিদের মধ্যে মোটামুটি দু'জনের উল্লেখ ইতিহাসে মাঝেসাঝে

পাওয়া যায়। বাকি সকলেই একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল। এরকম জুরিরও উল্লেখ আছে যে কিছুদিন আগে অব্দি বাণিজ্য করতো। আইন ব্যবস্থার কিছুমাত্র জ্ঞান তার নেই। ফলে নন্দকুমারের পক্ষ প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারছিলেন যে বিচারকার্যের নামে ঠিক কী ঘটতে চলেছে আগামীতে। তবু মনের জোরে সবাই এই আইনি প্রক্রিয়াটি চালিয়ে গেলেন। এর একটা বড় কারণ ছিল মজবুত সাক্ষী। নন্দকুমারের পক্ষে এরকম কিছু সাক্ষী রয়েছে তা এই কেসের মোড় এক বেলায় ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ধীরে ধীরে তাঁরা এজলাসে উপস্থিত হবেন।

জুরিদের মধ্যে একজন রবিনসন সাহেব। তিনিই ছিলেন জুরীদের মুখপাত্র বা ফোরম্যান। সকলের বক্তব্য শুনে তিনি আদালতকে জানাবেন। এই রবিনসন মিস্টার ফ্যারারের কাছে যেসব চিঠি লিখেছিলেন পরবর্তীকালে তাতেই মিস্টার ফ্যারার রবিনসনের বিদ্যাবুদ্ধি সম্পর্কে বুঝে গিয়েছিলেন। হেস্টিংসের সঙ্গে রবিনসনের বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত ছিল।

আর একজন ছিলেন ওয়েস্টন সাহেব। তিনি রবিনসনের থেকেও বেশি যোগ্য ছিলেন। তিনি ইংরেজ অধ্যাপক হলওয়েল সাহেবের চাকর হিসেবে এই দেশে এসেছিলেন। জাতিতে ইউরেশিয়ান। পরবর্তীকালে এই কেসের কিছুকাল আগে তাকে জুরি পদে দেখা যায়।

প্রধান বিচারপতি এলেইজা ইম্পে ঘোষণা করলেন,

—অ্যাক্ট অফ ১৭২৯ এর মাধ্যমে বিচার ক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

চারদিকে একটা হই হট্টগোল বেধে গেলো।

অ্যাক্ট অফ ১৭২৯ ইংল্যান্ডের এক কঠোর শাস্তির বিধান। ব্যাঙ্কের নোট বা চেক জাতীয় কোনো কাগজ জাল করলে

ইংল্যান্ডে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সেই আইন ইংল্যান্ডের বাইরে কোথাও চালু ছিল না। সেই আইনের মাধ্যমেই কলিকাতায় এই বিচারকার্য সংঘটিত হবে তা বলে দেওয়া হলো। একমাত্র স্যর চেম্বার্স এই সিদ্ধান্তে রাজি ছিলেন না। কিন্তু সবাই মিলে তাঁকেও এই হত্যালীলায় শামিল করে নিলেন।

উভয়পক্ষের যুক্তি তর্ক না শুনে পূর্ব নির্ধারিত একমুখী চিন্তার নির্যাস অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শুধু ইম্পে একাই নয়। লেমেইস্টার এবং হাইড দু'জনেই নন্দকুমারের শাস্তি সম্পর্কে শুরু থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। লেমেইস্টার তো বিচারের প্রায় এক মাস আগেই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন,

—এলাকার জন্য যদি বিচারকার্যে কোনো বাধা না আসে তবে নন্দকুমারের শাস্তি আটকানো যাবে না।

প্রথমদিন এভাবেই কেটে গেলো। সেদিন ফেরার পথে প্রধান বিচারপতি তো বটেই, হেস্টিংসকেও নানাবিধ কটূক্তি শুনতে হল।

মহারাজা নন্দকুমার যখন আদালত থেকে বেরোলেন চারদিকে জয়ধ্বনি উঠেছিল। মহারাজা নন্দকুমার হাত তুলে জনতাকে থামালেন। তাপর সিপাহিদের সঙ্গে কারাগারের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন রাতেই সভা করলেন হেস্টিংস। প্রধান বিচারপতিয়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। হেস্টিংস বললেন,

—নানকুমার আদালতে এলে হাঙ্গামা বেশি হবে। সিম্প্যাথি জন্মাবে মানুষের মনে। সুপ্রিম কোর্ট খলনায়কে পরিণত হবে। আমরা খলনায়ক হয়ে যাবো। আমাদের নিজের চিত্রনাট্যে এটা আমাদের সঙ্গে ঘটতে পারে না। আমরা নায়ক। খলনায়ক হচ্ছেন নানকুমার।

ইম্পে জিজ্ঞেস করলেন,

—উপায়?

হেস্টিংস সবার দিকে এক কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন,

—কাল থেকে নানকুমার আর আদালতে আসবেন না। ওকে ছাড়াই বিচার কার্য যেমন চলার তেমনি চলবে। এই বিচারে ওর দরকার নেই।

লেমেইস্টার আঁতকে উঠলেন,

—কী বলছেন? অভিযুক্তকে সামনে না রেখে বিচারকার্য? অভিযুক্তের দরকার নেই আদালতে?

হেস্টিংস লেমেইস্টারকে রক্তচক্ষু দেখালেন। কেটে কেটে বললেন,

—না দরকার নেই।

লেমেইস্টার আর কিছু বলার সাহস পেলেন না।

ইম্পে খুব একটা গায়ে মাখলেন না। যেখামে সবরকম লজ্জার মাথা খেয়েই এই বিচার ব্যবস্থা চলছে সেখানে এসব ভাবার মানে হয় না। তিনি বললেন,

—ঠিক আছে। হয়ে যাবে। কিন্তু নন্দকুমার থাকবে না বলে নিরাপত্তা কম থাকবে তা কিন্তু চলবে না।

হেস্টিংস আশ্বস্ত করলেন,

—সিপাহি আজ যেরকম ছিল সেরকমই থাকবে। শুধু নানকুমারকে আসতে হবে না। ও এলে অনুঘটকের কাজ করে।

পরেরদিন সকাল থেকেই চাউর করে দেওয়া হলো যে মহারাজা নন্দকুমার আদালতে আসবেন না। শুধুমাত্র অন্য রাজপুরুষেরা, ইংরেজ অধিপতিরা, আইনজীবীরা আসবেন। এছাড়া জুরি, বিচারকগণ এবং সাক্ষীরা উপস্থিত থাকবে।

মহারাজ নন্দকুমারের না আসা প্রথমদিকে এক গণ আক্রোশের জন্ম দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে সকলকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করলো। সিপাহিদের খুব বেশি বেগ পেতে হল না। নন্দকুমারকে ঘিরে আন্দোলন তুলনামূলক থিতিয়ে যেতে শুরু করলো। হেস্টিংসের মোক্ষম চাল এক্ষেত্রেও কাজ করলো।

একে একে সাক্ষীদের জবানবন্দি শুরু হল। প্রথম সাক্ষী ফরিয়াদি মোহনপ্রসাদ স্বয়ং। প্রেথমবার এজেহারে সে যে বয়ান দিয়েছিল সেই একই বয়ান এখানেও সে রাখল।

বুলোকি দাস যখন বারাণসী ফিরে গেলেন তখন মোহনপ্রসাদ ও পদ্মমোহনকে যে আমমোক্তারনামা তিনি দিয়েছিলেন আমমোক্তারনামায় তাঁর দেনাপাওনার একটি তালিকা ছিল। তাঁর কাছে নন্দকুমার দশ হাজার টাকা পেতেন বলে সেখানে উল্লেখ ছিল। আটচল্লিশ হাজার একুশ টাকার উল্লেখ সেখানে ছিল না। কাজেই নন্দকুমারকে দলিল জাল করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে আমমোক্তারনামাটির উপর মোহনপ্রসাদ ভীষণরকমভাবে নির্ভর করলো। কিন্তু সমস্যা ছিল এই আমমোক্তারনামায় যেমন ৪৮,০২১ টাকার উল্লেখ ছিল না, ঠিক তেমন কোম্পানির কাছে বুলোকি দাসের প্রাপ্য অর্থের উল্লেখও এটায় ছিল না। কাজেই তালিকাটি যে অসম্পূর্ণ ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না। এবার এই বক্তব্য মোহনদাস তার পূর্বের বক্তব্যের সঙ্গে জুড়ে আদালতে পেশ করে।

ফ্যারার এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আদালতকে জানালেন,

—মাই লর্ড, এই তালিকা বানিয়েছিলেন বুলোকি দাস মহাশয়ের হিসাবরক্ষক কৃষ্ণজীবন। এই তালিকা আন্দাজে প্রস্তুত

করা। সেটাও আবার ১৭৬৬ সাল অব্দি হিসাবই এখানে রয়েছে। এজন্যেই শুধু ৪৮,০২১ টাকা নয় কোম্পানির কাছে প্রাপ্য অর্থের হিসাবও এখানে নেই।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণজীবনকে কাঠগড়ায় ডেকে ফ্যারার জিজ্ঞেস করেছিলেন,

—এই আমমোক্তারনামা কি সম্পূর্ণ?

কৃষ্ণজীবন জানিয়েছিল,

—না হুজুর।

ফ্যারার আদালতকে জানান,

—একই কারণে সেখানে ৪৮,০২১ টাকার হিসেবও নেই মাই লর্ড। জাল দলিলের তারিখ ছিল ১৭৬৫ সালের ২০ অগাস্ট। ফলে এই আমমোক্তারনামাতে নন্দকুমারের প্রাপ্য ৪৮,০২১ টাকার উল্লেখ মানেই যে দলিল জাল তা প্রমাণ হচ্ছে না।

দ্বিতীয় যে বড় সাক্ষী নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলো সে ছিল কামালউদ্দিন আলি খাঁ। সে প্রথমে শপথ নিয়ে সমস্ত সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করলো। তারপর সে আদালতকে জানায়,

—আমার নাম কামালউদ্দিন আলি খাঁ। নবাব মির জাফরের আমলে কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকার পর আমি মুক্তিলাভ করি। তারপর আমি নবাবের কাছে দরখাস্ত করি। তখন মহারাজ নন্দকুমার তাঁর দেওয়ান। নন্দকুমার আমাকে আমার নামের নতুন মোহর মুদ্রণ করে দরখাস্ত পাঠাতে বললেন। দরখাস্তে আমার নামের মোহর মুদ্রণ করার জন্য আমার পুরনো মোহরটা তাঁর কাছে পাঠাই। তারপর চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। কিন্তু আমার মোহর আমি ফেরত পাইনি। সেটা তাঁর কাছেই রয়ে গেছে। সে

মোহর আমি ফেরত চাইলেও তিনি ফেরত দিতে চাননি।'

যে দলিল জাল করার অপরাধে মহারাজা নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই দলিলটা কামালউদ্দিনকে দেখানো হলো। প্রশ্ন করা হল,

—এই দলিলে কি আপনার নামের মোহরের ছাপ আছে?

কামালউদ্দীন বলল,

—হ্যাঁ ধর্মাবতার। এই দলিলে যে মোহরের ছাপ আছে তা আমারই নামের মোহর। এই মোহর আমি চৌদ্দ বছর আগে মহারাজ নন্দকুমারের কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার চাকর হোসেন আলি এর সাক্ষী। এই কথা আমি খাজা পেত্রজ ও মুনশি সদরুদ্দিনকে আগেই বলেছিলাম।

স্যর এলেইজা ইম্পে জিজ্ঞেস করলেন,

—এই দলিলে মোহর তোমারই নামের বলছো। তোমার নাম কামালউদ্দিন আলি খাঁ। কিন্তু দলিলে আব্দুল কামাল মহম্মদ রয়েছে? এই নামের পার্থক্যের কারণ কী?

কামালউদ্দিন হাত কচলাতে কচলাতে হাসিমুখে বলল,

—আমার নাম আগে আব্দুল কামাল মহম্মদ ছিল। কিন্তু নবাব নজমদৌল্লার সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁ-এর নায়েব সুবাদার হবার কয়েকদিন আগে আমি ওই নামের পরিবর্তে কামালউদ্দিন আলি খাঁ নাম ব্যবহার করতে শুরু করি। এই কামালউদ্দিন নামের অর্থ ধর্মে পূর্ণতা লাভ করা। আমি ধীরব ধীরে ধর্মকর্মে লিপ্ত হতে থাকি। তাই এই পরিবর্তন মহামান্য।

ফ্যারার কামালউদ্দিনকে জেরা করতে চাইলেন। ইম্পে তাঁকে সেই সুযোগ দিলেন।

মিস্টার ফ্যারার বললেন,

—যদি আমরা ধরে নিই আব্দুল কামাল মহম্মদ-ই এই খেতাব নিয়ে কামালউদ্দিন আলি খাঁ হয়েছিলেন, তা হলেও তার এই কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

ইম্পে জিজ্ঞেস করলেন,

—কীভাবে?

মিস্টার ফ্যারার বললেন,

—মহামান্য, নজমদৌল্লা ১৭৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলার মসনদে বসলেন। নবাব হওয়া মাত্রই তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ-কে নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং কামালউদ্দীন যদি যথার্থই নাম পরিবর্তন করে থাকে তবে ১৭৬৫ সালের প্রথম ভাগেই অর্থাৎ দলিল প্রস্তুত হবার সাত আট মাস আগেই তা করেছিলেন। কিন্তু এটা একেবারেই অসম্ভব যে নাম পরিবর্তনের দীর্ঘদিন পরে মহারাজ নন্দকুমার একটি দলিল জাল করছেন এবং সেই জাল দলিলে এরকম এক অভিজ্ঞ লোক কামালউদ্দিনের বর্তমান নাম ব্যবহার না করে আগের নামটি ব্যবহার করছেন। কথাটা মিলছে না মহামান্য। কামালউদ্দিন আপনি কিছু আলোকপাত করতে চাইবেন?

কামালউদ্দিন কথা হাতড়াচ্ছিলেন। ইম্পে জানতেন এসবই তাঁর তালিম দেওয়া কথা। তাই এই প্রশ্নের উত্তর যে কামালউদ্দিন দিতে পারবে না সেটা তিনি জানতেন। তাই তিনি ব্যপারটা ঘুরিয়ে দিলেন,

—আমাদের কাছে কামালউদ্দিনের কথা যথেষ্টই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। তবু আমাদের মনে কিছু প্রশ্ন আছে। সেটা আমরাই করছি। মিস্টার ফ্যারার আপনি নিজের জায়গায় বসুন।

ফ্যারার দেখলেন এখানে কিছুই হবার নয়। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট

জায়গায় বসে পড়লেন।

বিচারপতি হাইড কামালউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন,

—এই দলিলে যে তোমারই নামের মোহরের ছাপ আছে এবং সাক্ষীর জায়গায় তোমার নাম লেখা আছে সেটা তুমি কীভাবে জানতে পারলে?

কামালউদ্দিন এই প্রশ্নের তালিম নিয়েছিল। সে বললো,

—স্বয়ং নন্দকুমার আমাকে বলেছিলেন যে দলিলে সাক্ষীর জায়গায় তিনি আমার নামের মোহরের ছাপ দিয়েছেন এবং আমার নামও লিখেছেন। আমাকে এই দলিল সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য তিনি সাক্ষ্য দিতে বলেছিলেন। নাহলে তিনি আমার লবণের মহালের ইজারায় আর জামিন থাকবেন না। আমি এই মিথ্যাচারের অংশ হতে চাইনি। আমি গরিব মানুষ। লবণ দিয়েই সংসার চলে। তবু আমি এই মিথ্যাচার করতে পারিনি ধর্মাবতার। আমার কাছে মহারাজ নন্দকুমারের লেখা একটি চিঠি আছে। এটা তিনি আমাকে তখন পাঠিয়েছিলেন যখন তিনি আমার মোহর ও দরখাস্ত পেয়েছিলেন।

আদতে সেটি ছিল একটি জাল চিঠি, যা নন্দকুমার কখনো লেখেননি। সেই চিঠিতে মোহর নিয়ে একটি শব্দও ছিল না। তবু এলাইজা ইম্পে সেই চিঠিকে মঞ্জুর করলেন প্রমাণ হিসেবে।

কামালউদ্দিনের কথা সত্য প্রমাণ করার জন্য পরের সাক্ষী হিসেবে তার ভৃত্য হোসেন আলি মিয়াঁ-কে কাঠগড়ায় ডাকা হল। সত্য কথা বলার অঙ্গীকার করে সে বলল,

—আমার নাম হোসেন আলি। আমি কামালউদ্দিন আলি খাঁ-র চাকর। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে তিনি যে নালিশ করেছেন সেই সময়কাল থেকে আমি আমার মনিবের কাছেই আছি।

নন্দকুমারকে তিনি তার নামের মোহর পাঠিয়েছিলেন। এটা আমি জানি। কারণ মোহরটা একটি থলিতে করে পাঠানো হয়। আর সেই থলি আমিই সেলাই করেছিলাম।

পরবর্তী সাক্ষী ছিলেন খাজা পেত্রজ। তিনি শপথ নিয়ে বললেন,

—আমি আর্মেনিয়ান এবং কামালউদ্দিন এই দু'জনকে চিনি। চার বছর আগে কামালউদ্দিন একবার কথায় কথায় আমাকে বলেছিল যে তার নামের মোহর মহারাজ নন্দকুমারের কাছে আছে।

খাজা পেত্রজ ছিলেন হেস্টিংসের পুরনো বন্ধু। ১৭৬৪ সালে তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার অব্দি নিয়েছিলেন হেস্টিংস। তাঁর ভাই ছিলেন মির কাশিমের সেনাপতি। ভান্সিটার্ট ও হেস্টিংসের অনুরোধে তিনি তাঁর ভাইকে মির কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিরত করেন এবং ইংরেজদের পক্ষে। যোগ দিতে বলেন। মীরকাশিমের সন্দেহ হয়। তিনি সময় নষ্ট না করে সেনাপতিকে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

সেই রাগটা পেত্রজ নন্দকুমারের উপর দেখিয়ে গেলেন। এতোদিনে ভাতৃহত্যার কিছুমাত্র প্রতিশোধ নেওয়া গেল।

তারপর আদালতে উপস্থিত হলেন পরবর্তী সাক্ষী, মুনশি সদরুদ্দিন। তিনি এর আগে নন্দকুমারের পুরনো শত্রু গ্রেহাম সাহেবের মুনশি ছিলেন। গ্রেহাম সাহেব ইংল্যান্ড ফিরে যাবার সময় তাঁকে হেস্টিংসের বন্ধু বারওয়েল সাহেবের কাছে দিয়ে যান। ক্লেভারিং সাহেবের রিপোর্ট থেকে জানা যায় নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন সদরুদ্দিন।

শপথ গ্রহণ করে তিনি বললেন,

—আমার নাম সদরুদ্দিন। কামালউদ্দীন আমার কাছে বলেছিল যে মহারাজ নন্দকুমার একটা জাল দলিলে তার নামের মোহর মুদ্রণ করে ছেপে দিয়েছেন। এমনকী তার নামও লিখিয়েছেন এবং সেই দলিল যে সত্য তা প্রমাণ করতে তাকে ধমকিয়েছেন। লবণের মহাল ইজারার জামিন হতে মহারাজ নন্দকুমারকে সে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু নন্দকুমার সরাসরি তাকে বলেন যে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে তিনি জামিন হতে পারবেন না। আমি কামালউদ্দিনকে জিজ্ঞেস করি যে তোমার নামে মোহর নন্দকুমার পেলেন কীভাবে? তাতে কামালউদ্দিন আমাকে বলে যে চৌদ্দ বছর আগে একটা দরখাস্তে ছাপ দেবার জন্য তার নামের মোহর সে নিজেই নন্দকুমারের কাছে একটা থলিতে ভরে পাঠয়েছিলো। কিন্তু সেই মোহর এতো বছরেও সে আর ফেরত পায়নি।

কামালউদ্দিনের পর আর কোনো সাক্ষীকে মিস্টার ফ্যারার জেরা করতে পারেননি। তিনি জেরা করতে চাইলেও বিচারকেরা সেই জেরা করতে দেননি। একসময় তিনি হতাশ হয়ে নিজের বেঞ্চে বসে পড়লেন। আর উঠলেন না।

ষষ্ঠ সাক্ষী হিসেবে সহবৎ পাঠক নামের এক ব্রাহ্মণকে হাজির করা হল। ব্রাহ্মণ শপথ নিয়ে জানালেন,

—আমি শিলাবতের চাকর হিসেবে কাজ করতাম। আমি তাঁর হাতের লেখা চিনি। দলিলের এই দস্তখত শিলাবতের নিজের নয়। তাঁর লেখা এতো ভালো ছিল না।

মিস্টার ফ্যারারকে এবার জেরা করার সুযোগ দেওয়া হলো।

ফ্যারার জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি কবে কলিকাতা আসেন?

সহবৎ পাঠক জানালেন,

—নয় বছর আগে। বক্সারের যুদ্ধের সময় আমি ছিলাম।

মিস্টার ফ্যারার আবার জিজ্ঞেস করলেন,

—ভেবে বলুন।

পাঠক বললেন,

—একেবারে অভ্রান্ত কথাই আমি আদালতকে জানাচ্ছি।

মিস্টার ফ্যারার বললেন,

—মহামান্য আদালত এই মুহূর্তে সহবৎ পাঠকের বয়ান খারিজ করা হোক। বক্সারের যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৬৪ সালে অর্থাৎ আজ থেকে এগারো বছর আগে। আর তিনি দাবি করছেন শীলাবতের সঙ্গে তিনি নয় বছর আগে থেকেই ছিলেন। কিন্তু সেই সময় শীলাবৎ নিজেই এখানে ছিলেন না। ফলে তার হস্তাক্ষর চেনার মতো অবস্থায় তিনি থাকতেই পারেন না। তাঁর কথায় সামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে না।

এলাইজা ইম্পে অত্যন্ত অনিহা সত্ত্বেও পাঠকের বয়ান খারিজ করলেন। কিন্তু শপথ নিয়েও মিথ্যে বলার জন্য কোনোরূপ দণ্ড তাঁকে দেওয়া হলো না।

এরপর যিনি এলেন তিনি বাংলার অতিপ্রসিদ্ধ মানুষ। মুনশি নবকৃষ্ণ দেব, যিনি পরবর্তীকালে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বলে পরিচিত হয়েছিলেন সকলের কাছে। নবকৃষ্ণ ১৭৫০ সালে হেস্টিংসের মুনশি ছিলেন। তারপর তিনি ক্লাইভের মুনশি হলেন, পরে তাঁর বেনিয়ান হলেন। তাঁর সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের একটি বিশেষ শত্রুতার কারণ ছিল। নবকৃষ্ণ সাত সাতটি বিয়ে করেছিলেন। তার পরেও তাঁর উপর ধর্ষণের একটি অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণ হয়নি। ফলে কোনো শাস্তি হয়নি। কিন্তু সেই অভিযোগ তুলেছিলেন মহারাজা নন্দকুমার।

ফলে তাঁর উপর নবকৃষ্ণের অত্যধিক রাগ জমেছিল। সেই কারণেই হেস্টিংসকে তিনি সর্বোতোভাবে সাহায্য করেছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ শপথ গ্রহণ করে বললেন,

—আমার নাম নবকৃষ্ণ দেব। আমি বহুকাল ক্লাইভের মুনশি ছিলাম। মৃত বুলোকি দাসের পক্ষ থেকে শীলাবৎ আমার সঙ্গে যেসকল চিঠি চাপাটি আদান প্রদান করতেন তা থেকেই আমি তাঁর হস্তাক্ষর চিনতে পারি।

স্যর এলাইজা ইম্পে দেখলেন এই সুযোগ। তিনি দলিল তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—এতে শীলাবৎ-এর দস্তখৎ আছে কি?

নবকৃষ্ণ ভালো করে দেখে বললেন,

—হ্যাঁ আছে। এই তো শীলাবৎ-এর নাম। তবে এটা তার দস্তখৎ নয়।

ইম্পে আবার জিজ্ঞেস করলেন,

—আপনি শপথ করে বলতে পারেন এটা শীলাবৎ-এর দস্তখৎ নয়?

নবকৃষ্ণ বললেন,

—আমার কাছে শীলাবৎ চিঠি লিখতেন। তাছাড়া আমার সামনেও তিনি অনেক সময় লিখেছেন অনেক কিছু। এ লেখা তাঁর হতেই পারে না। তাঁর হস্তাক্ষর অত্যন্ত বিচ্ছিরি ছিল। এতো সুন্দর নয়। একমাত্র ভগবান জানেন এ লেখা তাঁর কি না!

নবকৃষ্ণ বুদ্ধিমান ছিলেন। সব বলেও শেষের লাইনে এরকম কথা বললেন যে বিচারপতিরা ফ্যাসাদে পড়লেন। দলিল যে জাল তা এই শেষ কথা থেকে প্রমাণ হয় না। নবকৃষ্ণ নন্দকুমারকে

ফাঁসালেন আবার জনগণের কাছেও ভালো হয়ে থাকলেন।

দলিলে শীলাবৎ-এর দস্তখৎ প্রকারান্তরে জাল বলে সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে নবকৃষ্ণের বরাত ভালোই খুলেছিল। ১৭৭৮ সালে হেস্টিংস কলিকাতার উপরেই তাঁকে প্রকাণ্ড তালুক দিলেন। তবে ১৭৮০ সালে হেস্টিংস তাঁর থেকে তিন লক্ষ টাকা ধার করেন। রাজা নবকৃষ্ণ এই টাকা আর আদায় করতে পারেননি। ১৭৯২ সালে তিনি এই টাকার দাবিতে বিলাতের আদালতে নালিশ করেন। হেস্টিংস দেনা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবু হেস্টিংসের প্রতাপে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

এদিকে বিচারকেরা পড়লেন মহাবিপদে। এলাইজা ইম্পে বললেন,

—আজ থেকে এই আদালতেই আমরা থাকবো। বিচারকার্য চলতে থাকবে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম চলবে। বিচার শেষ না হওয়া অব্দি আমরা কেউ আদালত ত্যাগ করবো না।

হেস্টিংস শীঘ্র বিচারের জন্য যে চাপ দিচ্ছিলেন তা সামলাতেই ইম্পে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বাদি-বিবাদি-সাক্ষী-উকিল-মোক্তার-বিচারক এমনকী, হেস্টিংস অব্দি ওই সময় আদালতেই থাকতেন। রাত বিরেতেও বিচারকার্য শুরু হয়ে যেত। বাইরে অপেক্ষমাণ জনতার ভিড় ধীরে ধীরে কমে এল। নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনি কিছুটা শিথিল করা গেল।

কামালউদ্দিনকে পরে সেশানে আবার জেরা করা হলো। একবার দুইবার নয়, নয় নয় করে নয়বার তাকে জেরা করা হলো। কোথাও যদি কিছু পাওয়া যায় যা দিয়ে এই দলিলকে সম্পূর্ণরূপে জাল বলে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু কামালউদ্দিনের বক্তব্যে সেটা করা গেল না।

সমস্ত সাক্ষীদের বারবার ডাকা হলো কাঠগড়ায়। কিন্তু ওই একইরকম জবাবদিহি করে দায় মেটালো সকলে।

বিচারকেরা মহা বিড়ম্বনায় পড়লেন। মূল দলিল যে জাল তা কোনোভাবেই প্রমাণিত হল না।

বিচারকগণ বাধ্য হয়ে প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত করার জন্য মিস্টার ফ্যারারকে আদেশ দিলেন।

ফ্যারার বললেন,

—আসামি বিরুদ্ধে জাল দলিল প্রস্তুতের অপরাধ একেবারেই প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং তাঁর পক্ষে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। আসামি এখনই খালাস পেতে পারে।

ইম্পে দেখলেন এতো আচ্ছা বিপদ। তিনি এই আর্জি অগ্রাহ্য করলেন।

মিস্টার ফ্যারার একপ্রকার বাধ্য হয়ে মোহনপ্রসাদ-কে ডাকলেন,

—দলিলে তুমি এরকম কী দেখলে যে দলিলকে তোমার জাল বলে সন্দেহ হল?

মোহনপ্রসাদ ঢোক গিলে বললেন,

—এতে বুলোকি দাসের নাম সই করা ছিল না। আমি জানতাম শীলাবৎ দেড় বছর আগে মারা গিয়েছেন।

মিস্টার ফ্যারার আদালতকে বললেন,

—কাজেই দেখা যাচ্ছে দলিলে যে নামের মোহর ছিল তা খাঁটি তা জাল নয়। কারণ মোহনপ্রসাদের সন্দেহ বা আপত্তি ছিল যে দলিলে বুলোকি দাসের স্বাক্ষর ছিল না। নামের মোহর কিংবা ছাপ যে জাল তার কোনো প্রমাণও আমরা পাইনি। ফলে মূল দলিলটাকে জাল বলাও যাচ্ছে না। দলিলে শুধুমাত্র বুলোকি দাসে

স্বাক্ষর ছিল না বলে মোহনপ্রসাদ তাকে জাল বলে অভিযোগ করেছিলেন।

বিচারকেরা মিস্টার ফ্যারের এইসব যুক্তি একেবারেই গ্রাহ্য করলেন না। লেমেইস্টার বললেন,

—আসামির বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অতএব আপনাকে সাফাই সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। নতুবা জুরিদের কাছে আমরা আসামির বিরুদ্ধে প্রমাণের আলোচনা করবো।

ফ্যারার দেখলেন সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়ে যাবে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে অনন্যোপায় হয়ে ফ্যারা আদেশ মানতে বাধ্য হলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের পক্ষেও অনেক সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ডাকার আগে মিস্টার ফ্যারার বিচারকদের বললেন,

—বুলোকি দাস যখন এই দলিল রচনা করেন তখন যারা উপস্থিত ছিল তাদের আমি একে সাক্ষ্য দিতে ডাকবো। তাছাড়া মোহনদপ্রসাদ যখন বুলোকি দাসের এই দলিল দেওয়ায় কথা জানতে পারেন তখন এই দলিলের সাক্ষী মহতাব রায় এবং আব্দুল কামাল মহম্মদ জীবিত ছিলেন। এটাও এই আদালতে প্রমাণিত হবে। বুলোকি দাসের লেখা চিঠিপত্র আমি দেখাবো। তাতে আপনারা অলঙ্কার ও দলিলের উল্লেখও পাবেন। আর গঙ্গাবিষ্ণুর সামনে মোহনপ্রসাদ ও পদ্মমোহন দাসের স্বাক্ষরিত একটি হিসাব দাখিল করবো। তাতেও এই দলিলের টাকার উল্লেখ আপনারা পাবেন। বুলোকি দাসেএ সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের যে সকল চিঠিপত্রের বিনিময় হয়েছিল তাতে এবং বুলোকিদাসের নিজের হাতে লেখা একটা কাগজেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

এই কথাগুলো শুনে হেস্টিংসের তো বটেই এলাইজা ইম্পেরও

শরীর ঘেমে উঠলো। মিস্টার ফ্যারার যা বলছেন তা যদি তিনি করে দেখান তাহলে এতো কিছু করেও কিছু লাভ হবে না। সুপ্রিম কোর্টে চোখে চোখে হেস্টিংস ও ইম্পের ইশারায় কথা হলো। যাই হোক, দেখে নিতে হবে।

এবার ধীরে ধীরে সাক্ষীদের জবানবন্দি শুরু হল।

প্রথম সাক্ষী তেজ রায়। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, বাড়ি চুঁচুড়া। ইনি দলিলের সাক্ষী মহতাব রায়ের ছোট ভাই। তিনি শপথ নিয়ে আদালতকে জানালেন,

—আমি তেজ রায়। মহতাব রায়ের ছোট ভাই। আমি মহতাব রায়ের নামের মোহর দেওয়া একটি চিঠি নিয়ে এসেছি। এই মোহর দাদা সবসময় ব্যবহার করতেন। আমি নিশ্চিত দলিলেও এই মোহরের ছাপ রয়েছে।

তাঁর সাক্ষীতে দলিলের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

এরপর হাজারি মল ও কাশীনাথ নামে দুই সাক্ষীকে পরপর জেরা করা হয়। বিচারপতিদের আদেশে তেজ রায়কে নামিয়ে এই দুইজনের সাক্ষী নেওয়া হয়। তেজ রায়কে অধিক সময় বলতে দিলে মুশকিলে পড়তে হবে বলেই তড়িঘড়ি এই কাজ করা হয়েছিল। ওরা ছিল হেস্টিংসের অনুগত। কাশীনাথ মিস্টার রাসেল নামক এক সাহেবের বেনিয়ান। তবে তারা দু'জনেই নন্দকুমারের বিপক্ষে সাক্ষী দিলেন। তবে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁদের কাছে সাক্ষী দেবার ফরমায়েশ গিয়েছিল বলে তালিম দেওয়ার সুযোগ হয়নি। তাঁরা পরস্পর- বিরোধী কথাবার্তা বলে নেমে গেলেন। মাঝখান থেকে তেজ রায় আর বক্তব্য রাখতে পারলেন না। বিচারকদের উদ্দেশ্য সফল হল।

তবে পরের সাক্ষী রূপনারায়ণ চৌধুরীর জবানবন্দিতে তেজ

রায়ের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তিনি আদালতকে জানান,

—মহতাব রায় আজীবন ওই এক মোহর ব্যবহার করেছেন। তার মোহর জাল হবার প্রশ্নই আসে না।

রূপনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। তিনি বর্ধমানের রানির পেশকার ছিলেন। কলিকাতার কাউন্সিল কর্তৃক বর্ধমানের রাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তারপর একে একে জয়দেব চৌবে, চৈতন্যনাথ, লালা ডোমেন সিং এবং ইয়ার মহম্মদ এই চারজন সাক্ষী দলিলে সত্যতা নিশ্চিত করলেন। ফরিয়াদী পক্ষের কঠিন জেরাতেও তাঁদের মতামত পালটানো গেল না। দলিলের লেখা, মোহরের ছাপ এবং মহম্মদ কামালের উপস্থিতি সম্পর্কে ওঁরা সবাই এক কথাই বলে গেলেন। আব্দুল কামাল মহম্মদ যে মারা গিয়েছেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ জয়দেব ও ইয়ার মহম্মদের সাক্ষীতে পাওয়া গেলো। আব্দুল কামাল মহম্মদ ছিলেন এঁদের বন্ধু। তাঁকে দাফন করার দিন এঁরা উপস্থিত ছিলেন। এর থেকে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

বুলোকি দাসের নামের মোহরের ছাপ প্রমাণ করার জন্য লালা ডোমেন সিং তিন তিনটে চিঠির খামের উপর মোহরের ছাপ দেখালো।

ইম্পে কী করবেন না বুঝে বললেন,

—শুধু ছাপ দেখলে চলবে না। ভিতরের চিঠি খোলা হোক।

চিঠিতে বুলোকি দাস যা লিখেছিলেন তা দেখার পর বিচারকেরা দেখলেন এতে বুলোকি দাসের স্বাক্ষর নেই। তারা এই চিঠি তিনটিকে বাতিল করলেন।

—যেহেতু বুলোকি দাসের স্বাক্ষর নেই তাই এই চিঠির কোনো সত্যতা নেই।

মিস্টার ফ্যারার বললেন,

—সেই সময়ের ফারসি রীতি অনুযায়ী স্বাক্ষর না করে শুধু নামের মোহরের ছাপ দিয়ে চিঠি লেখা হতো। এমনকী দলিলেও এজাই পদ্ধতির ব্যবহার ছিল। সমকক্ষ লোকের কাছে চিঠি লিখতে সাধারণত খামের উপর আর পদমর্যাদায় খাটো লোকের কাছে চিঠির নীচে নামের মোহরের ছাপ দেবার প্রচলন ছিল। নাম স্বাক্ষরের প্রয়োজনই পড়তো না। এভাবে লালা ডোমেন সিংহের চিঠিগুলোকে আমরা বাতিল করতে পারি না। ওগুলো জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ইম্পে বললেন,

—এটা সুপ্রিম কোর্ট। এখানে প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। প্রমাণকে দেওয়া হয়। চিঠিতে স্বাক্ষর নেই মানে সেই চিঠি বাতিল হবে।

এরকম অবস্থায় জুরিরা চিঠিগুলো দেখতে চাইলেন। প্রধান জুরি রবিনসন চিঠিগুলো পরীক্ষা করে বললেন,

—চিঠিগুলো অতি অল্পদিনের বলে মনে হচ্ছে। এই চিঠিগুলো জাল নয়তো!

এবার মিস্টার ফ্যারের ধৈর্যচুতি ঘটলো। তিনি রেগে গিয়ে বলে বসলেন,

—আইনি ব্যপারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই এরকম একটা কথা বলতে পারেন। নিতান্ত অবিবেচক ও হঠকারী না হলে এরকম একটা পোক্ত প্রমাণকে কেউ জাল বলে উল্লেখ করে না।

স্যর এলাইজা ইম্পে মিস্টার ফ্যারারকে সাবধান করে বললেন,

—একজন জুরিকে আদালতে এভাবে বলার অধিকার আপনার

নেই। আরেকবার যদি আপনি এরকম কোনো কাজ করেন তবে এই আদালতে প্রবেশ করা থেকে আপনাকে বিরত করা হবে। আমরা চিঠিগুলোকে বাতিল করলাম।

মিস্টার ফ্যারার হতাশ হয়ে পড়লেন। দলিল যে জাল নয় তা এই চিঠিগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়ে যেত। যেখানে ফারসি প্রথাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ চিঠির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন। আর চিঠিগুলো বাতিল হওয়ার অর্থ নন্দকুমারের সমূহ সর্বনাশ।

আদালত সেদিনের মতো মুলতবি ঘোষণা করা হল।

মিস্টার ফ্যারার সেদিন কারাগারে নন্দকুমারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁর মন অশান্ত ছিল। তিনি চোখের দামনে দেখছিলেন সমস্ত বিচারব্যবস্থা অন্ধের মতো হেস্টিংসকে সাহায্য করে চলেছে।

মহারাজ নন্দকুমার এসব বহু আগের থেকেই জানতেন। তিনি তাঁর শত্রুদের ভালো করে চিনতেন। তাই তিনি একেবারেই আশ্চর্য হলেন না। তিনি ফ্যারার কাছে সব শুনলেন এবং শুনে বললেন,

—আমি বুঝে গেছি বিচারকেরাই আমার শত্রু। আর নতুন সাক্ষী উপস্থিত করা, প্রমাণ দেবার চেষ্টা করা সবই বৃথা। আমার সাক্ষীদের সঙ্গে যেরকম অন্যায় হচ্ছে তা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আর কিছুই করার দরকার নেই। আপনিও অনেক চেষ্টা করেছেন। আর করবেন না দয়া করে। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

ফ্যারারও মোটামুটি মেনে নিলে নন্দকুমারের কথা। তিনি বললেন,

—আমি যখনই বিচারকদের সঙ্গে বাদানুবাদ করছি আমার সাক্ষীদের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের অর্থাৎ

সরকার পক্ষের সাক্ষীদের প্রতি কঠোর ভাব দেখানো দূরে কথা সঠিকভাবে তাদের জেরাই করা হচ্ছে না। বিচারপতি চেম্বার্স মাঝে সাঝে সেটা আদালতে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু বাকিদের সামনে তাঁর কথা গুরুত্ব থাকে না।

মহারাজ নন্দকুমার হাসলেন।

ফ্যারার আবার বললেন,

—কামালউদ্দিনের কথাই ধরুন না। তার নামে এই অদ্ভুত পরিবর্তন সম্পর্কে তাকে জেরাই করতে দিলো না। সে যদি নবাবের কাছ থেকে খেতাব হিসেবেও এই নাম পেয়ে থাকে তার একটা সনদ থাকবে। সেটা কোথায়? বিচারপতিরা সেই সনদ না দেখেই তার কথায় বিশ্বাস করছেন কেন? বিচারপতিদের উচিত ছিল কামালউদ্দিন ও মোহনপ্রসাদকে নিরপেক্ষভাবে জেরা করে প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করা।

নন্দকুমার এবার সজোরে হাসলেন,

—আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না। এই পুরো সিস্টেমটাই চাইছে আমার ফাঁসি। হেস্টিংস চাইছে আমার ফাঁসি। আর আপনি একা কুম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এসব ছাড়ুন আপনার ডিগ্রি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন। আমি ভিতরে যাই।

নন্দকুমার প্রস্থান করলেন। ফ্যারার চিৎকার করলেন।

—আমি কাল শেষ চেষ্টা করবো দেওয়ানজি। কাল মির আসাদ আলিকে সাক্ষীতে ডাকছি।

নন্দকুমার একবার থমকালেন। মির আসাদ আলি। তার মনে পড়ল সব। তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে কারাগারের ভিতরে চলে গেলেন।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



পরেরদিন সকাল দশটায় এজলাস শুরু হলো। গতকাল রাতে সকলের ভালো ঘুম হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। সকলের উদ্দীপ্তভাবে আজ বসে আছেন নিজের নিজের জায়গায়।

স্যর এলাইজা ইম্পে বললেন,

—মিস্টার ফ্যারার শুরু করুন

মিস্টার ফ্যারার হাসিমুখে উঠে দাড়ালেন।

—মহামান্য আদালত, আমি আজ একজন প্রধান সাক্ষীকে এই আদালতে ডাকতে চলেছি। তাঁর নাম মির আসাদ আলি।

এলাইজা ইম্পে এর সম্পর্কে জানতেন না। তিনি ভ্রু কোঁচকালেন। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন,

—বেশ ডাকুন।

মির আসাদ আলি ছিলেন এক পদস্থ লোক। বক্সার যুদ্ধ বিজয়ী মেজর মুনরোর কাছ থেকে তিনি দুই হাজার টাকা পেয়েছিলেন। সেদিন নন্দকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারপর তিনি পাটনা টাঁকশালের দারোগা হয়েছিলেন।

মির আসাদ আলি কাঠগড়ায় এলেন। তিনি শপথ গ্রহণ করার পর আদালতকে প্রথমেই একটা রসিদ দিলেন। ১৭৬৪ সালের রসিদ। তারপর তিনি বললেন,

—এই রসিদে বুলোকি দাসের নামের মোহরের ছাপ পাবেন আপনারা। বক্সারের যুদ্ধের আগে বুলোকি দাস মীর কাশিমের সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেই সময় রোটাসগড় দুর্গ থেকে আমার মারফতে কিছু টাকা পাঠানো হয়। আমি সেই টাকা মির কাশিমের কাছে পৌঁছে দিই। মির কাশিম সেই টাকা নেননি। তিনি আমাকে বুলোকি দাসের কাছে যেতে বললেন। টাকা পেয়ে বুলোকি দাস আমাকে রসিদ দিলেন।

এই টাকাটা মির কাশিমের। বুলোকি দাস তাঁর পক্ষ থেকে শুধু টাকাটা গ্রহণ করেছিলেন। আপনারা লক্ষ্য করুন রসিদটিতে লেখা আছে 'গোলাম কর্তৃক গৃহীত'। এই রসিদ খুব দরকারি মনে করে আমি এটাকে ভাঁজ করে সুতো দিয়ে জড়িয়ে রাখি। তারপর এটাকে তাবিজের মধ্যে পুরে আমার হাতে বেঁধে রাখি। এখন সেই কবচ থেকে বের করে আপনাদের দিলাম। আপনারা তো দেখলেন আমি আপনাদের সামনেই এই বহুদিন পুরনো কবচ থেকে এই রসিদটি বের করেছি।

ইম্পে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

—এই রসিদ আপনি মির কাশিমকে দেননি কেন?

মির আসাদ উত্তরে বললেন,

—তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। মির কাশিমের পরিজনবর্গ কে কোথায় আছেন কোনোও ঠিক-ঠিকানা নেই। চারদিকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। ততদিনে তিনি আর রটাসগড়ে নেই। পালিয়ে গিয়েছেন সেখান থেকে। এই জন্য এই রসিদ আমার কাছেই থেকে গেল।

সমস্ত বিচারকগণ এই মোহর পরীক্ষা করলেন। জুরিরাও দেখলেন। এই মোহরের ছাপ এবং দলিলের মোহরের ছাপ যে

একই তা সকলে মেনে নিলেন। দলিল যে জাল নয় তা সবার সামনেই প্রমাণিত হল। ইম্পে সেটা স্বীকারও করলেন যে দুটো মোহরের ছাপ একই। কিন্তু তারপরেও লজ্জার মাথা খেয়ে ইম্পে বললেন,

—আপনার কথাকে প্রমাণ করতে পারে এরকম কোনো সাক্ষী যেহেতু নেই তাই আপনার রসিদকে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না। আর যেহেতু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাচ্ছে না তাই এই রসিদকে আমরা বাতিল করছি।

মিস্টার ফ্যারার হাঁ হাঁ করে উঠলেন। আসাদ আলি হাতজোড় করে বললেন,

—আমার কাছে সাক্ষী আছে। আমাকে প্রমাণ করার সুযোগ দিন। আমি এই আদালতে তাকে ডেকে আনবো।

ইম্পে সেই সুযোগ আসাদ আলিকে দিলেন না। উপরন্তু পরেরদিন আদালতে নতুন পাঁচ ইংরেজ সাক্ষী দুটিয়ে আনা হলো যারা আসাদ আলির বক্তব্যকে খণ্ডন করলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন কর্নেল, একজন মেজর এবং একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। তারপর এঁদের প্রত্যেকেই হেস্টিংসে পক্ষ থেকে উপঢৌকন পেয়েছিলেন।

মিস্টার ফ্যারার নাছোড়বান্দা। তিনি আবার মোহনদাস বলে নন্দকুমারের পক্ষে একজনকে হাজির করলেন। সেদিন সন্ধেতেই যুগল নামের একজনকে উপস্থিত করা হলো যে মোহনদাসের বিবৃতি খণ্ডন করবে। যখনই কোনো সাক্ষী নন্দকুমারের পক্ষ নিয়ে কথা বলতেন তার বিপক্ষের লোক সেদিনেই হাজির করা হতো। এদের প্রত্যকেই অজ্ঞাতকুলশীল। এই কেসের সঙ্গে তাদের দূর-দূরান্তের সম্পর্ক ছিল না।

মিস্টার ফ্যারার মনোহর মিত্র নামে একজন সাক্ষীকে হাজির করলেন। তিনি শপথ নিয়ে বললেন,

—আমি মনোহর মিত্র। নন্দকুমারের গ্রেপ্তারের তিন দিন আগে মোহনপ্রসাদ আমাকে ডেকে পাঠায়। আমি যাই। সে একটা দলিল আমাকে দেখায়। সেই দলিলে অলঙ্কারের কথা লেখা ছিল। দলিলটা আমার হাতে লেখা, এটা সে আমাকে বলতে বলে। সে আমাকে দুটো টিপ সই দেখায়। সে বলে, যদি আমি দলিলটা আমারই হাতের লেখা বলি তা হলে মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবেন এবং ভয়ানক শাস্তি পাবেন। এই কাজের জন্য সে আমাকে পাঁচ হাজার টাকাও ফিতে চেয়েছিলো। আমি অস্বীকার করলে সে বলে যে আমি না পারলে তাকে অন্তত কেউ একজনকে খুঁজে দিতে যে এই কাজে তাকে সাহায্য করতে পারবে। যত টাকা লাগে সে দেবে। আমি তাকে স্পষ্ট জানাই যে এরকম ভীষণ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কথা বলে আমি চলে আসি।

মনোহর মিত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কারাধ্যক্ষ ইয়েন্ডেল সাহেব ও ফরিয়াদী পক্ষের ডারহাম সাহেবকে উপস্থিত করা হয়েছিল। ফলে মনোহর মিত্রের জবানবন্দি সহজেই মিথ্যে প্রমাণিত হল।

নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষী দিলে যেভাবে খণ্ডন করা হচ্ছিল সেই একই প্রক্রিয়া নন্দকুমারের বিপক্ষে সাক্ষী দিলে নেওয়া হচ্ছিলো না।

মোহনপ্রসাদ যদিও বলেছিলেন যে,

—নন্দকুমারের গ্রেপ্তারির আগে এক সপ্তাহের মধ্যেও মনোহর মিত্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। আসল দলিল আমি কখনোই তাকে দেখাইনি। তবে বছর দুয়েক আগে এই দলিলের একটা

নকল তাকে দেখিয়েছিলাম বটে।

কিন্তু এই কথা মোহনপ্রসাদের একেবারে হাতে তৈরি কৃষ্ণজীবন অস্বীকার করেছিলেন। কৃষ্ণজীবনকে দুই পক্ষই সাক্ষীর তালিকায় রেখেছিলো। একমাত্র সাক্ষী যিনি দুই পক্ষেই সাক্ষী দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণজীবন বলেছিলেন,

—আমি মনোহর মিত্রকে মোহনপ্রসাদের বাড়িতে দেখেছিলাম। মহারাজ নন্দকুমারের গ্রেপ্তারির দিনকয়েক আগেই তিনি মোহনপ্রসাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

কৃষ্ণজীবন আরও বলেছিল,

—বুলোকি দাস ফারসি ভাষার লেখা দলিলপত্রে তাঁর নামের মোহরই কেবল ব্যবহার করতেন কিন্তু নাগরিক ভাষায় লিখলে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। মির কাশিমের সিপাহিদের বেতন তিনিই দিতেন। তিনি সিপাহিদের কাছ থেকে হুকুমনামা গ্রহণ করে ফারসি ভাষায় লিখিত এক একটি কাগজের টুকরো তাদের দিয়ে দিতেন। তাতে তার নাম স্বাক্ষর করা থাকতো না। মোহরের ছাপ থাকতো শুধু।

দুই কানকাটা বিচারকেরা কৃষ্ণজীবনের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করলেন না। অথচ কৃষ্ণজীবন নন্দকুমারের বিপক্ষে যেসব কথা বলেছিলেন তা আদালতে গ্রাহ্য হলো। অদ্ভুত এক বিচার ব্যবস্থার প্রহসন চলছিল। এক আইনি নিধনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তৎকালীন সুপ্রিম কোর্ট।

আরেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন রমানাথ দাস। শুরুতে ফরিয়াদী পক্ষ থেকে তাকে ডাকার কথা থাকলেও তাকে বিনা কারণে অগ্রাহ্য করা হয়। আসামী পক্ষ থেকে মিস্টার ফ্যারার কিছু

সন্দেহ করেন। তিনি রমানাথকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে নেন।

রমানাথ দাস শপথ করে বললেন,

—আমি রমানাথ দাস। মহারাজা নন্দকুমারের গ্রেপ্তারির দশ-বারো দিন আগে আমি তাঁর কাছ থেকে একটি সংবাদ নিয়ে মোহনপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই যে মহারাজ নন্দকুমার এই মামলা করতে নিষেধ করছেন। আমরা নিজেরাই এর একটা সমাধান খুঁজে নিচ্ছি। তখন মোহন প্রসাদ আমাকে বলে যে এ কী করে সম্ভব? আমি কীভাবে এখন মামলা করা স্থগিত করতে পারি? আমি পদস্থ ইংরেজ অফিসারদের কথা দিয়ে ফেলেছি। যদি কথা না দিতাম তাহলে এটা সম্ভব ছিল।

আদালতে প্রমাণ হয়ে গেলো মোহনপ্রসাদ যে হেস্টিংসের বাড়িতে যেতেন শলা পরামর্শ করতেন মহারাজা নন্দকুমারের বিষয়ে। ফ্যারার সাহেবও এটাই প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে মোহনপ্রসাদ নামেমাত্র বাদী। আসল বাদী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেই।

মোহনপ্রসাদ মামলা না করলেও পারতো। কিন্তু ইংরেজ ভদ্রলোকদের জন্য তা সম্ভব হয়নি।

মিস্টার ফ্যারারের হাতে আর কিছু করার ছিল না। একে একে তার সমস্ত সাক্ষীকেই মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার পর এই বিচার জুরিদের হাতে যাবার সময় হয়ে এলো। এমনিতেও এই দেখনদারি মামলা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার একটা চাপ ছিল। তাই জুরিদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি স্যর এলাইজা ইম্পে জুরিদের কাছে মহারাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ও সপক্ষে প্রদত্ত প্রমাণের সমালোচনা করতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন,

—মোহনপ্রসাদের সাক্ষ্যের উপর ফরিয়াদী পক্ষের মোকদ্দমা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সে অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে কি না তা আপনারাই বিচার করবেন। আপনারা প্রায় সকলেই তাকে চেনেন। সে কতদূর বিশ্বাসযোগ্য এটা আপনারা জানেন। এটা কি আদৌ সম্ভব যে ঈর্ষাবশত সে কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করতে পারবে? আপনারা বিচার করুন। আপনাদের থেকে আমরা সকলে সঠিক সিদ্ধান্তের আশা করে বসে আছি। কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে যেন চরম দণ্ড নেমে আসে তা সুনিশ্চিত করুন।

এলাইজা ইম্পে মনোহর মিত্রের সাক্ষ্য বা রামনাথ দাসের সাক্ষ্যে যে ইংরেজদের কথা উঠে এসেছে তার উল্লেখমাত্র করলেন না। নিজের অভিভাষণে পরোক্ষে এটাই তিনি জানালেন যে মোহনদাস অতিশয় সজ্জন। তার পক্ষে কোনো নির্দোষের পক্ষে মামলা করা অসম্ভব।

ইম্পের এর অভিভাষণ নানারকম ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। ফরিয়াদী পক্ষের প্রমাণের দোষ নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করলেন না। আসামির দোষ প্রমাণ করার ভার ফরিয়াদী পক্ষের উপর না ফেলে আসামি নন্দকুমারকে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে বলা হল সম্পূর্ণ কেস জুড়ে। সেটা করার চেষ্টা করলে বাধা দেওয়া হল। নিজের অভিভাষণে তিন তিনবার নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করার অনুরোধ করলেন। মির আসাদ আলি বা তেজ রায়ের সাক্ষ্যের কোনো উল্লেখ তাঁর অভিভাষণে ছিল না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ফরিয়াদী পক্ষকে সমর্থন করে বলবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। অথচ নন্দকুমারের ফাঁসি পূর্ব নির্ধারিত। তাই ইম্পে জুরিদের বললেন,

—যদি আসামি পক্ষের প্রমাণে আপনারা বিশ্বাস না করেন

তাহলে বুঝতে হবে এটা মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং সেই মিথ্যা অত্যন্ত গুরুতর রকমের। কারণ এর দ্বারা আসামি পক্ষ ফরিয়াদী পক্ষের ও তার সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ দেবার এবং উৎকোচ দিয়ে অন্যের দ্বারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ানোর দোষারোপ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে।

এরকম পক্ষপাতদুষ্ট অভিভাষণের পর মিস্টার ফ্যারার কিছু সময়ের জন্য আদালত ত্যাগ করলেন। তাঁর পক্ষে এই প্রহসন মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তিনি তাঁর সেরা চেষ্টাটুকু নিংড়ে দিয়েছিলেন।

ইম্পে তখনো বলে চলেছেন,

—আপনারা পক্ষপাতশূন্য বিচার করুন। আপনার সময় নিয়ে আমাদের বিচারকার্য শুনেছেন সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই।

ততক্ষণে ফ্যারার ফিরে এলেন। একবার শেষ চেষ্টা করার তাগিদে তিনি বললেন,

—সাক্ষ্য প্রমাণাদির সমালোচনা করার একটা সুযোগ চাই।

বিচারপতি লেমেইস্টার বললেন,

—প্রধান বিচারপতির অভিভাষণের পর আর কাউকে বলার সুযোগ দেওয়া যায় না। আমরা দুঃখিত!

জুরিগণ আদালত কক্ষ ছেড়ে ভিতরে চলে গেলেন। প্রায় এক ঘন্টা পর সকলে বেরিয়ে এলেন।

জুরি প্রধান রবিনসন সাহেব সকলের সম্মুখে ঘোষণা দিলেন,

—আমাদের মতে মহারাজা নন্দকুমার অপরাধী।

ওয়ারেন হেস্টিংস, বারওয়েল, এলাইজা ইম্পেসহ অন্যান্যরা সকলে আনন্দে আত্মহারা হলেন।

শুধু মিস্টার ফ্যারার এই আনন্দ উৎসবে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি হেরে গেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার হেরে গেছেন।



জুরিদের মত গ্রহণের পর প্রধান বিচারকের লিখিত রায় প্রকাশ করবার নিয়ম। কিন্তু মহারাজা নন্দকুমারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন করা হলো না।

প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে মুখেই ঘোষণা দিলেন,

—মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হবে।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশে সারা বাংলাদেশে ঝড় উঠল। দুঃখে, ক্ষোভে, অসন্তোষে মানুষ ফেটে পড়লো। দেশের বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করতে উঠে পড়ে লাগলেন। বহু লোক প্রার্থনা করতে লাগলেন। নিয়মিত জমায়েত হতে লাগলো। কিন্তু বিচারকেরা সেই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে লাগলেন।

হেস্টিংস তাড়া দিচ্ছিলেন,

—ওই ব্যাটাকে তাড়াতাড়ি ঝুলিয়ে দাও।

ইম্পে বললেন,

—হেস্টিংস তোমার কাজ হয়ে গেছে। এবার আমাদের সামলাতে দাও। ওভাবে ওকে ঝোলানো যাবে না। কোম্পানির কথাও ভাবতে হবে। চারদিক থেকে আমরা চাপে আছি।

হেস্টিংসের আর তর সইছিল না।

বাংলার নবাব মোবারকদৌল্লা কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেলকে লিখলেন,

> 'এ দেশের পুরনো ব্যাপারের বা অপরাধের বিচার করতেও ওদি আপনারা ইংল্যান্ডে নতুন নিয়ম ব্যবহার করেন তা হলে অনর্থ হয়ে যাবে। দেশবাসীর সর্বনাশ হবে। সুপ্রিম কোর্টে যেভাবে মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হয়েছে তা অত্যন্ত কঠোর বলেই মনে হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওদি জাল করা অপরাধ সাব্যস্ত হয়েও থাকে তাহলে আমাদের দেশের নিয়মানুযায়ী প্রাণদণ্ড হতে পারে না। যতদূর জানি ইংল্যান্ডেও এই অপরাধে আগে প্রাণদণ্ড হতো না। কিছুকাল ধরে সেটা চালু হয়েছে। আর একটা কথা, মহারাজ নন্দকুমার কিন্তু ইংরেজদের জন্য বহু বিশেষ কাজ করেছেন। বিশেষত মির কাশিম যখন ইংরেজদের উচ্ছেদ সাধন করতে এবং তাদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন আমার পিতা আর মহারাজা নন্দকুমার-ই ইংরেজ সৈনিকদের খাদ্য ও অর্থের জোগান দিয়েছিলেন। এতে ওরা প্রাণে বেঁচে যায়। আপনিও তখন এই দলে ছিলেন। এটা আপনাদের স্মরণে থাকা উচিত। তিনি যে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সেই দোষ তাঁর পদমর্যাদার লোক করতেই পারে না। তিনি গুরুতর রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন বলে বহু মানুষ তাঁর শত্রু। তাঁর শত্রুরাই তাঁকে ফাঁসিয়েছে। কাজেই সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যতদিন ইংক্যান্ডেশ্বরের অভিমত না জানতে পারা যায় ততদিন মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকুক।'

কাউন্সিল এই আবেদন পত্র বিচারপতিদের পাঠিয়ে দিলেন। এতে এলাইজা ইম্পের অবশিষ্ট ধৈর্যেরও বিনাশ ঘটলো। তিনি নবাবকে লিখলেন,

'কাউন্সিলে এরূপ আবেদন পত্র পাঠিয়ে আপনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। কাজেই এই আবেদন পত্রপাঠ অগ্রাহ্য করা হল।'

মহারাজের জীবন রক্ষার জন্য মিস্টার ফ্যারার তখনো চেষ্টা করছিলেন। তাঁর ফাঁসির হুকুম স্থগিত রাখার জন্য তিনি আপিল করলেন। বিচারপতিরা যাতে আসামির প্রতি দয়াপরবশ হয় এই জন্য একটা আবেদনপত্র লিখলেন। জুরিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অনুরোধ করতে লাগলেন। কারণ জুরিরা অনুরোধ করলেই বিচারপতিরা দয়া পরবশ হয়ে থাকেন।

প্রধান জুরী রবিনসন তাঁকে জানালেন,

—নন্দকুমারের জন্য আমার মনে দয়ার ভাব জাগছে। কিন্তু আমি যেহেতু শপথ গ্রহণ করে এই বিচারকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাই আমাকে যতই কঠোর হতে হয় আমি হবো। এর অন্যথা হবে না। আর মিস্টার ফ্যারার আপনি একজন আইনজীবী হয়ে এরকম আবেগপ্রবণ কীভাবে হতে পারেন? আমি আপনার আচরণে আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি।

রবিনসন এখানেই থামলেন না। তিনি বেলি নামক এক উচ্চপদস্থ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি ছিলেন হেস্টিংসের সেক্রেটারি। ইনি হেস্টিংসের বাড়তেই থাকতেন। বেলি সাহেব হেস্টিংসের সঙ্গে আলোচনা করলেন। হেস্টিংস তাঁকে বললেন,

—আমি এখন ব্যস্ত আছি। ইম্পেকে জানিয়ে দাও।

বেলি তখন প্রধান বিচারপতি ইম্পে সাহেবকে চিঠি লিখে

জানালেন,

'ফ্যারার সাহেব এসেছিলেন জুরি রবিনসন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। ফাঁসি স্থগিত রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। রবিনসন সাহেবকে তাঁর শপথ বিরুদ্ধ কাজ করতে অনুরোধ করায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। ফ্যারার সাহেবের এই ব্যবহার তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি চাইছেন তাঁকে যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়।'

প্রধান বিচারপতি অভিযোগ করার অনুনতি দিলেন না বটে। কিন্তু ফ্যারারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে লিখলেন,

'এরকম গর্হিত কাজ করলে আগামীদিনে শাস্তি নিশ্চিত। এরকম ঘৃণ্য আবেদনপত্র জুরিদের দ্বারা স্বাক্ষর করার চেষ্টা আইনজীবীদের শোভা দেয় না। কোনো আইনজীবীর নৈতিক অধঃ পতন হলেই সে এগুলো করতে পারে।'

মিস্টার ফ্যারারের অফিসে এই চিঠি বোমের মতো আছড়ে পড়লো। ধীরে ধীরে সমস্ত জায়গা থেকেই তিনি বাতিল হতে থাকলেন। কার অঙ্গুলি হেলনে এসব হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

আসলে ফ্যারার চেয়েছিলেন ফাঁসির উপর একটা স্থগিতাদেশ লাগিয়ে তারপর ইংল্যান্ডেশ্বরের কাছে আবেদন করা। কিছুটা সময় তাতে পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না।

মিস্টার ফ্যারারের আবেদনপত্র দেখে এডওয়ার্ড অ্যালারিংটন নামের এক জুরির নাম জানতে পারা যায়। তিনি স্থগিতাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আবেদনপত্র ইতিহাসকালের গভীরে হারিয়ে গিয়েছে। কোনো কাজে লাগেনি।

এদিকে হেস্টিংস ও বারওয়েল একদিন মন্ত্রণা করতে বসলেন। হেস্টিংস বললেন,

—চারদিকে যা চলছে তা আমার ভালো লাগছে না।

বারওয়েল বললেন,

—স্যর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের প্রতি দেশীয় মানুষদের একটা ঘৃণা কাজ করছে। সেটা দূর না করলে আগামী দিনে সুপ্রিম কোর্টের উপর মানুষের ভরসা থাকবে না এটা নিয়ে কিছু ভাবুন প্লিজ।

হেস্টিংস মাথা নাড়লেন,

—ঠিক বলেছো। একটা কাজ করো।

বারওয়েল উৎসাহের সঙ্গে বললেন,

—বলুন স্যর।

হেস্টিংস পরিকল্পনাটা বললেন,

—নানকুমারের কেসে যে ন্যয়বিচার হতেছে সেটা দেশবাসীকে জানাতে হবে। একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করো। সেখানে বিচারপতিদের অভিনন্দিত করা হবে। সারা দেশ জানবে যে সুপ্রিম কোর্ট মানেই ন্যয়বিচার এবং দোষীদের চরম শাস্তি।

বারওয়েল আর মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে পড়লেন। হেস্টিংসের আদেশ তাঁর কাছে ঈশ্বরের আদেশের সমান। তাঁর অনুচরবৃন্দ লেগে পড়লো এই অভিনন্দন উৎসবের কাজে। দেশীয়দের মধ্যে কান্ত পোদ্দার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ দেব ইত্যাদিরা সাহায্য করলেন।

এলাইজা ইম্পেসহ সমস্ত বিচারকদের কাছে নিমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়া হলো। কলিকাতার বুকে একটা বড় সড় জায়গায় জমকালো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলো।

সেই অনুষ্ঠানে মেরে কেটে পঞ্চাশজন মানুষ উপস্থিত হলেন। নন্দকুমারের জুরিরা, বারওয়েলের খানসামারা, হেস্টিংসের

ইংরেজ বন্ধুরা ছাড়া দেশীয় বিশ্বাসঘাতকগুলো ছিল।

হেস্টিংস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হলেন। অভিনন্দন পত্র ও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হলো বিচারপতিদের হাতে। চেম্বার্স সাহেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সার্কাসে অংশগ্রহণ করলেন।

অভিনন্দন পত্রে লেখা ছিল,

> 'ইংল্যান্ডের আইনানুসারে সুপ্রিম কোর্ট কলিকাতার অধিবাসীদের বিচার করবে শুনে আমাদের বড়ই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় যেরকম সুবিচার হয়েছে তাতে আমাদের সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়েছে। প্রধান বিচারপতি স্যর এলাইজা ইম্পে এবং অপর তিনজন বিচারপতি স্যর রবার্ট চেম্বার্স, জোহান হাইড ও স্টিফেন সিজার লেমেইস্টার এই মোকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা বোঝার জন্য যেরকম পরিশ্রম করেছেন তাতে আমরা তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই দেশ, এই দেশের ইতিহাস সবসময় আপনাদের কথা মনে রাখবে।'

পরের দিন বিভিন্ন জায়গায় ফলাও করে এই খবর প্রচারিত হয়েছিল। ইংরেজরা মুখে মুখেই এই খবর চারদিকে প্রচার করছিলেন। ধীরে ধীরে বাংলার মানুষ সুপ্রিম কোর্টে গুরুত্ব বুঝতে শুরু করলেন।

হেস্টিংসের এই চালটিও সেই সময় কার্যকরী হয়ে উঠেছিল।

ফ্যারার সাহেব কিন্তু দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। তিনি মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে দেখা করেন। তিনিই প্রথম তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছিলেন।

মহারাজা নন্দকুমার বললেন,

—আরে এতো আমি শুরু থেকেই জানি। আপনি এতো

ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

ফ্যারার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মহারাজের এই উত্তরে। তিনি বললেন,

—আপনি একটা চিঠি লিখবেন?

মহারাজা সকৌতুক জিজ্ঞেস করলেন,

—প্রাণভিক্ষা?

ফ্যারার সাহেব মাথা নাড়লেন। নন্দকুমার বললেন,

—পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আপনি কি আদৌ বুঝতে পারছেন না নাকি বুঝতে চাইছেন না। হেস্টিংস আমার বধের পর বাংলাদেশে সম্পূর্ণ রাজত্ব কায়েম করতে পারবে। আর কেউ তাঁর অপকর্মের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। সে আমায় প্রাণভিক্ষা দেবে ভাবছেন কীভাবে? আর তাছাড়া আমার এখন আর কিছু আসে যায় না। কারাগারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ফাঁসির দিন মুক্ত হয়ে যাবো।

ফ্যারার আর কিছু বলার সাহস পেলেন না। ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে এক নিদারুণ কাণ্ড ঘটালেন।

মহারাজ নন্দকুমারের নামে নিজে একটা চিঠি লিখলেন। চিঠির বক্তব্যে মহারাজ নন্দকুমার বলছেন,

> 'আমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হয়েছে তাতে আমার দেশের আইন ও ধর্মানুসারে আমার নিষ্কলঙ্ক বংশের উপরেও চিরকালের জন্য কলঙ্ক আরোপ করবে। ইংল্যান্ডেশ্বরের যে আইন সুপ্রিম কোর্টকে এরকম ভয়ঙ্কর আদেশ দেবার ক্ষমতা দিয়েছে সেই একই আইন প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করার ক্ষমতাও দিয়েছে।
>
> যে আইন ইংল্যান্ডে কেবলমাত্র ইংরেজদের জন্যই

বিধিবদ্ধ হয়েছে সেই আইনই আজ বাংলাদেশের এক বাঙালি হিন্দুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। নিজ ধর্মের নামে শপথ করে বলছি—আমি নির্দোষ।

আমি যে অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি বিচারের সময় ফরিয়াদী পক্ষের নিজেদের কথাতেই প্রমাণ হয়েছে যে তা অন্তত ছয় সাত বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে এই অপরাধ করা হয়েছে বলে প্রমাণ করা হয়েছে। তাহলে তা নবনির্মিত আদালতে নতুন বিলাতি আইন অনুযায়ী কেন সম্পন্ন হচ্ছে?

সুতরাং যাতে আমি ইংল্যান্ডেশ্বরের অনুগ্রহ লাভের সুযোগ পাই সেজন্য আপনি আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্থগিত রাখবেন এই আশা রাখছি। আমি আপনার মনুষ্যত্বের এবং ক্রিষ্টের প্রতি দয়ার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। আমার বয়স সত্তর বছর। এটাও আপনারা স্মরণে রাখবেন।'

আবেদন পত্রের শেষভাগে মুঘল রাজ সরকারে তথা বাংলার নবাবের সময়ে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাঁর পদগৌরব, বংশ ও জাতিমর্যাদা, দেশময় তাঁর প্রতিপত্তি ও খ্যাতির কথাও উল্লেখ করে দিলেন মিস্টার ফ্যারার। ইংরেজদের জন্য তিনি কী কী উপকার করেছে সেইসবের উল্লেখও চিঠিতে করে দেওয়া হলো।

মিস্টার ফ্যারার বৃথাই এই চিঠি লিখলেন। ইংক্যান্ডেশ্বর অব্দি এই চিঠি কোনোদিনই পৌছল না কারণ তা পৌঁছতে তিন-চারমাস সময় লাগে। সুপ্রিম কোর্টে এক কপি পাঠানো হয়েছিল যা পত্রপাঠ অগ্রাহ্য করা হয়।

জুন মাসের মধ্যেই বিচার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলের ইচ্ছা থাকলেও জুলাইয়ে ফাঁসি দেওয়া সম্ভব হল না। এর একটা বড়

কারণ হেস্টিংসের প্রতিশোধ স্পৃহা।

কাউন্সিলে স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং এবং মনসনের মাধ্যমে বারবার হেনস্তা হতে হয়েছিল হেস্টিংসকে। তারাই তাঁদের উপরে একটা ক্ষোভ ছিল।

হেস্টিংস একদিন কারাগারে এলেন। নন্দকুমার তখন বসে আছেন তাঁর আসনে। হেস্টিংস তাঁকে দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

—দেখলে তো নানকুমার আমার সঙ্গে বেয়াদপির ফলাফল। কোথায় পৌঁছে দিলাম তোমাকে।

নন্দকুমার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন,

—তারপরেও আমার সঙ্গে দেখা করতে আপনাকে আসতে হচ্ছে। আমাকে আজ অব্দি আপনার দরবারে যেতে হয়নি।

মুহূর্তে হেস্টিংসের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। যার কিছুদিন পর ফাঁসি হবে তার মুখে এরকম কথা আসে কোথা থেকে!

হেস্টিংস বললেন,

—তোমার এই অবস্থার জন্য আমি দুঃখিত নই। তুমিও নিশ্চয়ই বহু মানুষকে এভাবেই ফাঁসিয়েছো।

নন্দকুমার বাধা দিলেন,

—আমার আর আপনার মধ্যে পার্থক্য আছে ছিল। আপনি আমাকে ছলে বলে শেষ করতে চেয়েছেন। আপনি আমার অনিষ্ট চিন্তা করেছেন। আমি কারো অনিষ্টের কথা ভাবিনি।

হেস্টিংস বাঁকা হাসি হাসলেন,

—সিরাজের ক্ষেত্রে...

নন্দকুমার মাথা উঁচু করে বললেন,

—সিরাজের সাম্রাজ্যে কতজন খুশি ছিল জানার চেষ্টা করুন

আমার উত্তর পেয়ে যাবেন। সেটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল। সে নিয়ে যে যা ভাবার ভাবুক। আর সিরাজকে সরানোর পর আপনাদেরও সরিয়ে দিতাম। ওটাই করা উচিত ছিল। আপনারা যে আমার থেকে কত সাহায্য পেয়েছেন তার তো কোনো ইয়ত্তাই নেই। কিন্তু ওখানেই আমার ভুলটা হয়েছিল। তবু বলছি আমার করার মধ্যে আর আপনার করার মধ্যে পার্থক্য ছিল আছে থাকবে।

হেস্টিংস সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন এবার।

—কাউন্সিলের ফ্রান্সিস, মনসন এবং ক্লেভারিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই আমি। তোমাকে আমার পক্ষ নিতে হবে। তুমি স্বীকার করে নেবে যে কাউন্সিলের ওই তিন সভ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আমার বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ তুমি করেছিলে নানকুমার। তুমি যদি এটা করো তাহলে আমি তোমার ফাঁসিতে স্থগিতাদেশ নিয়ে ভাবতে পারি।

নন্দকুমার এবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন।

—আপনার দরিদ্র অবস্থা আর কাটছে না দেখছি। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামির কাছ থেকেও চাই আর চাই। ফাঁসির আদেশটা আমি কবুল করে নিয়েছি জাঁহাপনা। আপনি এবার এখান থেকে বিদায় হোন। আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে।

মহারাজ নন্দকুমারের এহেন স্পর্ধা তিনি আশা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর পায়ে এসে পড়বেন নন্দকুমার। উল্টে হেস্টিংসকে তাড়িয়ে দিলো লোকটা। গজগজ করতে করতে তিনি চলে এলেন।

মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে করতেও মহারাজা নন্দকুমার ফ্রান্সিস, মনসন এবং ক্লেভারিংয়ের জন্য মঙ্গলকামনা করেছিলেন। এই

অবস্থায় নির্ভীক ও ন্যায়পরায়ণ থাকাটা কঠিন। সেটাই তিনি করে দেখিয়েছিলেন। দেশবাসী কখনো এটা ভুলে যেতে পারে না।

৫ অগাস্ট, ১৭৭৫ সালে ফাঁসির আদেশ বলবৎ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো। এই কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ইংরেজ পিশাচেরা একত্রে উৎসবে যোগ দিল সেই রাতে।

যতদিন না ফাঁসি বলবৎ হচ্ছিলো ততদিন দেশীয় মানুষজনেরা কারাগারে ভিড় করতে লাগলেন। দলে দলে মানুষ এসে ভিড় করতে লাগলেন মহারাজা নন্দকুমারকে একবার দেখার জন্য। কারাগারের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বাড়ানো হলো। সবাই এসে অন্তরের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানিয়ে যেত। মহারাজ বসে থাকতেন। সবাইকে হাসিমুখে সময় দিতেন। কেউ দেরি করে এসে পৌঁছলেও মহারাজ নিজের নিদ্রা ত্যাগ করে এমনকী, নিজের খাবার ফেলে হাত ধুয়ে উঠে দেখা করতেন।

একবার জেলার জিজ্ঞেস করেছিলেন,

—কী দরকার এসব ঝক্কির? আপনার তো বয়স হয়েছে?

নন্দকুমার স্বভাবসুলভ হাসিটি হেসে নিজের গোঁফে তাঁ দিতে দিতে বলেছিলেন,

—আর তো দেখা হবে না। আর তো কথা হবে না।

কঠিন হৃদয়ের জেলারের মনটাও দুমড়ে গিয়েছিল এই উত্তরে।

এভাবেই একদিন জুলাই মাস শেষ হয়ে গেলো। ৪ আগস্ট উপস্থিত হলো।

মহারাজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব-সহ বহু লোক তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করতে এলেন কারাগারে। সবার চোখেই জল। সবার দৃষ্টি করুণ। কিন্তু আজ মহারাজের চিত্ত বিচলিত নয়। তিনি স্থিতধী

হয়ে সবার সঙ্গে দেখা করলেন। পুত্র গুরুদাসকে বললেন,

—একখানা চিঠি পাবে। তাতে সব লিখে যাব। চিন্তা করো না।

জামাতা রাধাচরণ রায় ও মেয়েকে বললেন,

—তোমরা চিন্তা কোরো না। রাধাচরণের কিছু হবে না। ওদের কার্য সমাধা হয়ে গেছে। ফোকস সাহেবেরও কিছু হবে না। নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা।

সকলেই মহারাজকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সকলে ফিরে গেলে তিনি সান্ধ বন্দনা শেষ করলেন। তারপর রাজা গুরুদাসের উদ্দেশে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। বিষয় কার্য্য পরিচালনা কীভাবে করতে হবে সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন তাতে। বিগত কিছু হিসাবপত্র দেখলেন এবং সেই চিঠিতে তা জুড়ে দিলেন। সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়েও তাতে যা লেখার সমস্তই লিখে রাখলেন।

এমনি এক সময় জেলের অধ্যক্ষ ম্যাক্রেবি সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ নন্দকুমার প্রফুল্লচিত্তে তাঁকে স্বাগত জানালেন,

—সাহেব বসুন।

ম্যাক্রেবি সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন নন্দকুমার হয়তো শোকে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন। কিছু মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হলো নন্দকুমার হয়তো তার আদেশ এবং আদেশের তারিখ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।

—আপনি জানেন আগামিকাল আপনার ফাঁসি?

উত্তর নন্দকুমার বললেন,

—হ্যাঁ জানি। ভোরে আমি তৈরি থাকবো। আপনি আসছেন তো?

ম্যাক্রেবি সাহেব আর কথার উত্তর খুঁজে পাননি। কারাগারে অসংখ্য অসহনীয় মর্মভেদী আর্তনাদে অভ্যস্ত ম্যাক্রেবি সাহেব এমন দৃশ্য, এরকম অভ্যর্থনা আশা করেননি। তিনি মহারাজের পাশে এসে বসলেন। সাধারণত তিনি কোনো কয়েদি আসামীর পাশে কখনো বসেন না। বাকি সিপাহিরা এই দৃশ্য দেখে অবাক হলেন।

ম্যাক্রেবি সাহেব নির্ভীক নিষ্কম্পভাবে বসে থাকে নন্দকুমারকে বললেন,

—মহারাজ কালই তো আপনাকে এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। আপনি আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার যদি কারো সঙ্গে দেখা করতে হয়, কোনো বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা মনে জাগে, কিংবা অন্য কোনোরূপ কিছু প্রয়োজন হয় আপনি আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

মহারাজ নন্দকুমার সহাস্যে স্নিগ্ধভাবে জানালেন,

—আপনার দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ থাকলাম। এই মুহূর্তে বিশেষ কিছুর দরকার নেই। তবে আপনি ফ্রান্সিস সাহেব, মনসন সাহেব এবং ক্লেভারিং সাহেবকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দেবেন। নন্দকুমার মরেও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ম্যাক্রেবি সাহেব চলে গেলেন। মহারাজা নন্দকুমার রাতের আহার শেষ করে নিদ্রা গেলেন। গভীর নিদ্রা। একেবারে ঘুমিয়ে যাবার আগে শেষ ঘুম।

ভোর হবার আগেই মহারাজ উঠে পড়লেন। স্নান করলেন। গুরুদেবের কথা স্মরণ করলেন। আরাধ্যের বন্দনা করলেন। ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থেকে বাকি সময়টা কাটালেন। কোনো আহার আর গ্রহণ করলেন না।

ভোর হতেই ম্যাক্রেবি সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। নন্দকুমার সুন্দরভাবে তাকে অভিবাদন দিয়ে জানালেন,

—আমি প্রস্তুত।

খিদিরপুরের পুলের পূর্বদিকে যে জায়গা বর্তমানে কুলির বাজার বলে পরিচিত সেই সময় এই রাস্তায় এতো মনুষ্য চলাচল থাকতো না। সেখানেই একটি কুয়ো খনন করা হয়েছিল। সেই জায়গাটিকেই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

মহারাজ নন্দকুমার প্রস্তুত হয়ে কারাগারের বাইরে এলেন। সেখান থেকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পালকি এল। তিনি পালকিতে চড়ে বসলেন। ম্যাক্রেবি সাহেব তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন।

এই জনশূন্য রাস্তায় আজ মানুষের ঢল নেমেছে। কয়েক সহস্র মানুষ আজ জমায়েত হয়েছে। প্রকাশ্য ফাঁসি দেখার চেয়ে মহারাজ নন্দকুমারকে দেখার ভিড় বেশি। মানুষ কাঁদছে। মানুষ আজ শোকার্ত। নিরাপত্তাবাহিনী সমস্ত কিছু সামাল দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আজ আর কোনো গন্ডগোল হলো না।

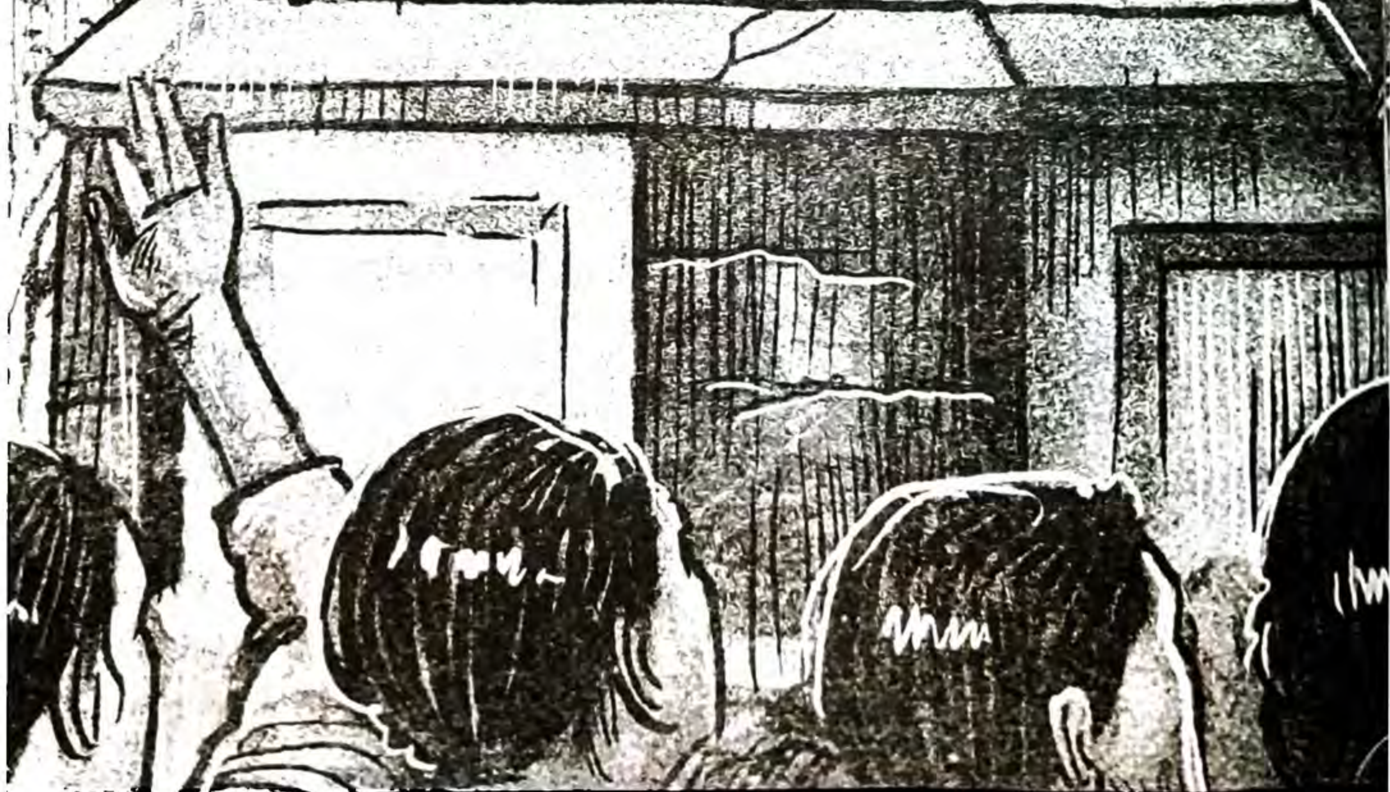
মহারাজের পালকি দেখা যেতেই 'হায় হায়' রব উঠল। সমস্ত কলিকাতা যেন আজ খিদিরপুরে এসে জমা হয়েছে। সকলের বুকফাটা করুণ আর্তনাদের মাঝে পালকি এগোতে লাগল।

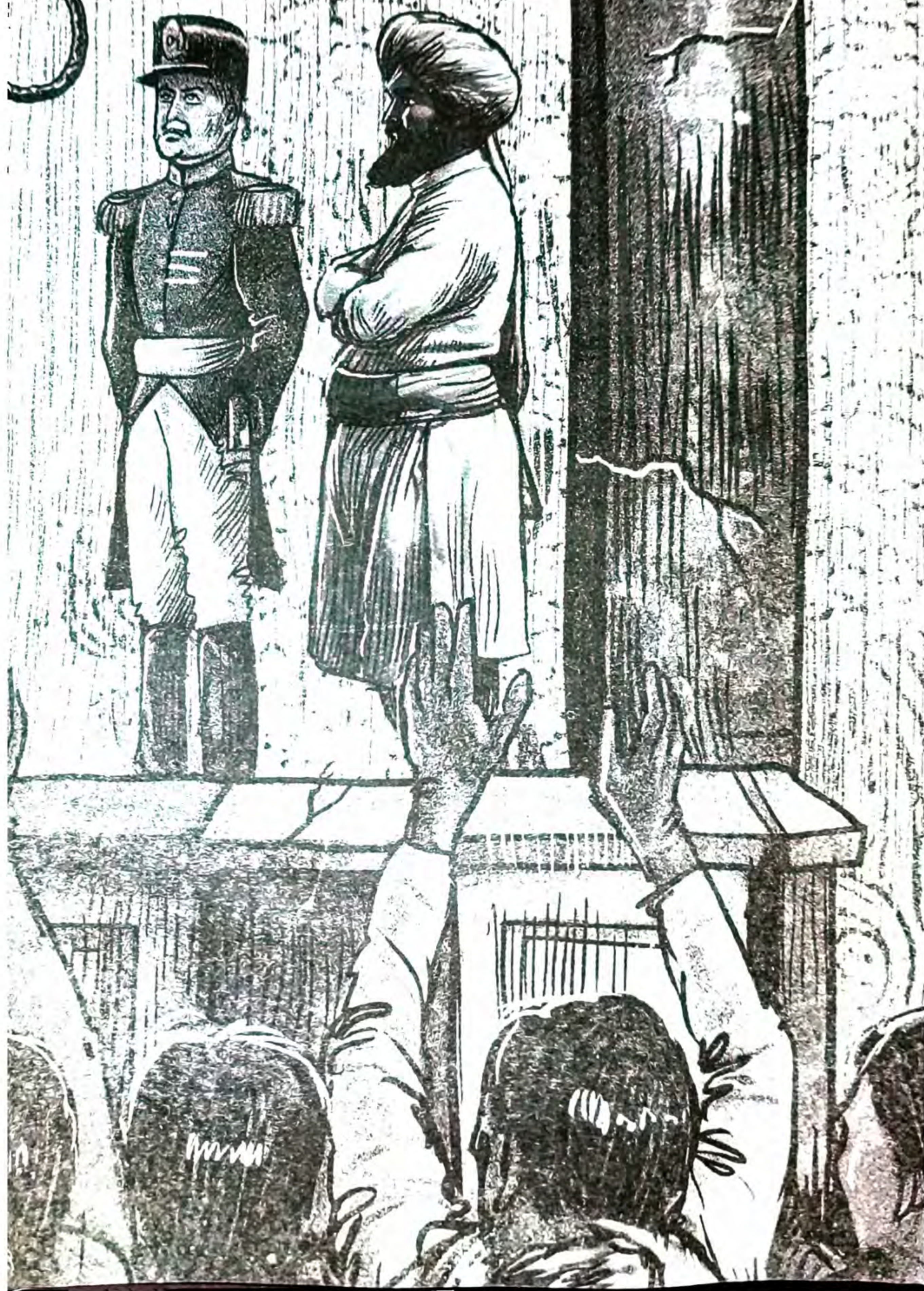
পাল্কিকে রাস্তা করে দেওয়ার জন্য মানুষ দুইধারে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার মাঝখান দিয়ে এগোতে লাগলো পালকি।

মহারাজ নন্দকুমার বাহককে নির্দেশ দিলেন,

—পালকির রুদ্ধদ্বার খুলে দিন।







রুদ্ধ দ্বার খুলতেই 'হায় হায়' ধ্বনি বেড়ে গেল।

সকাল সাড়ে সাতটায় মহারাজ নন্দকুমারের পালকি নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলো। তাঁর ইচ্ছানুসারে কয়েকজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তারাই পরবর্তীকালে তাঁর শবদেহ বহন করবেন।

মহারাজ নন্দককুমার পালকি থেকে বেরোনো মাত্র জনোচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়ালো। মানুষ চিৎকার করে কাঁদছে। আসমুদ্রহিমাচল সেই গগনভেদী আর্তনাদে কেঁপে উঠছে।

মহারাজ নন্দকুমার স্বাভাবিক স্থির চোখে সবার দিকে তাকালেন। হাত তুলে অভিবাদন করলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন। ম্যাক্রেবি সাহেব সঙ্গে ছিলেন শেষ মুহূর্ত অব্দি। এরকম এক পুরুষের সঙ্গ তিনি আজীবন মনে রাখবেন।

মহারাজ তখন তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কারো চিন্তায় মগ্ন ছিলেন না। তার শুধু একটাই চিন্তা ছিল। দেশমাতৃকার জন্য তার আবেগ যখন জাগ্রত হয়েছিল তারপর তিনি খুব বেশি সময় আর পাননি। আগামী দিনে যে দেশের উপর এক ভয়ঙ্কর বিপদ আসতে চলেছে তা তিনি বুঝে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তিনি আর নিরসন করতে পারলেন না বলে তার একটা দুঃখ মনে রয়ে গিয়েছিল।

মহারাজ ফাঁসির দড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পূর্বনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণেরা এগিয়ে এলেন। নন্দকুমারের ইচ্ছানুসারেই তাঁর হাত তাঁরা বেঁধে দিলেন। কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে দেবার আগে একবার চোখ বন্ধ করে ভগবানকে স্মরণ করলেন তিনি।

ম্যাক্রেবি সাহেবের চোখে অব্দি জল চলে এলো। তাঁর শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। তবু দায়িত্ব তো পালন করতেই হবে। কাঁদছিল আপামর জনগণ।

মহারাজ নন্দকুমার নিজের ফাঁসিকাঠে উঠে দাড়ালেন। জল্লাদ তাঁর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকতে চাইলো। তিনি বারণ করলেন। শত সহস্র মানুষ এই দৃশ্য মনে ভয় নিয়ে হলেও দেখছিলো।

মহারাজ নিজেই জল্লাদকে তক্তা সরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। জল্লাদ সেই অনুরোধকে আদেশের মতো পালন করলো। কয়েক লহমা মাত্র বাংলাদেশের ভূতপূর্ব মন্ত্রী, মিরজাফরের ঘনিষ্ঠ দেওয়ানজি, বর্তমান নবাবের দেওয়ানের পিতা মহারাজা নন্দকুমারের নিস্পন্দ দেহ কুয়োর ভিতরে ঝুলতে লাগলো। এক ব্রাহ্মণের আইনি হত্যা সংঘটিত হলো কলিকাতার বুকে। ব্রহ্মহত্যা!

এবার জনগণের আগল ভেঙে গেলো। চারদিকে রব উঠলো,

—ধর্ম গেল ধর্ম গেল।

—কলিকাতা অপবিত্র হলো।

—বাংলাদেশ পাপে ডুবিলো।

- ব্রহ্মহত্যার পাপ হলো।।

ব্রহ্মহত্যা দেখাও মহাপাপ। বহু মানুষ এই পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। জনস্রোত ভেঙে গেল। চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো জনস্রোত। নিরাপত্তার বেষ্টনী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

কথিত আছে সেদিন কলিকাতায় বহু বাঙালি পরিবার আহার গ্রহণ করেনি। গঙ্গা এক পার থেকে অন্য পারে গিয়ে অনেকে আহার করেছেন। বহু মানুষ ব্রহ্মহত্যার এই শহর কলিকাতা একেবারের জন্য ত্যাগ করে চলে গেলেন। কোম্পানি শাসিত দেশে তাঁরা থাকতে চাইলেন না।

ব্রাহ্মণেরা তখন মহারাজা নন্দকুমারের শবদেহ বহন করে

চলছিলেন। সঙ্গে পুত্র রাজা গুরুদাস এবং তাঁর পরিবার ছিল।

মহারাজা নন্দকুমার এতোদিনে শান্তিতে ঘুমোলেন। আর তাঁকে দরবার করতে হবে না। আর কোনো সালিশি সভা বসবে না। আর কেউ তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলবে না। আর কোনো আদালতে তাঁর বিচার হবে না।

মহারাজা নন্দকুমার ঘুমোলেন। এতোই ভালোভাবে ঘুমোলেন যে ইতিহাসের পাতা অব্দি তাঁকে আর মনে রাখলো না। চিরঘুম স্থায়ী হোক।

অরাজকতা এক্সক্লুসিভ



মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির কিছুকাল পরেই ইম্পে এবং হেস্টিংস যুক্তি করে দো-ভাষী ইলিয়ট সাহেবকে ইংল্যান্ডে পাঠালেন। ইলিয়ট অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। চতুর ও জোগাড়ে প্রকৃতির বলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাই তাঁর তদ্বিরতায় এই ঘৃণ্য কাজ করেও ওঁরা ইংল্যান্ডে নিন্দিত হবেন না বলেই তাদের বিশ্বাস ছিল। উল্টে সমর্থন পাবেন তারা ধরেই নিয়েছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগের ফলে যখন হেস্টিংস চারদিকে অন্ধকার দেখছিলেন তখন এক প্রকার পদত্যাগপত্র তিনি লিখেই ফেলেছিলেন। এখন যখন আর নন্দকুমার জীবিত নেই এবং বাংলাদেশে তার সমকক্ষ এরকম কেউ নেই যে তাঁর বা তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে পারে তখন এই পদত্যাগ পত্রের আর কোনো গুরুত্ব নেই। তিনি সেই পদত্যাগপত্র ছিঁড়ে আগুনে ভস্মীভূত করলেন।

কিছু মানুষ এই পদত্যাগপত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেসবকে পাত্তা না দিয়ে হেস্টিংস গভর্নর জেনারেলের পদ আঁকড়ে বসে রইলেন। পদ ছাড়তে তিনি কখনোই রাজি হলেন না।

মহারাজের ফাঁসির দিন পনেরো পর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হলো। নন্দকুমার যেহেতু আর জীবিত নন তাই তাঁকে নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা হলো না। রাধারমণ রায়ের উপর সুপ্রিম কোর্টের এলাকা আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই তিনি মুক্তি পেলেন। বাকি থাকলেন জোসেফ ফোকস। ফোকস অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। বিচারকেরা অনেক পরামর্শ করে পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড দিলেন। অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলার প্রধান আসামির পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হলো কিন্তু নন্দকুমারের হলো ফাঁসি। আসলে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যে নন্দকুমারের কোনো প্রকার সাজাই হবে না তা হেস্টিংস ভালোভাবেই জানতেন। তাই তাঁকে শায়েস্তা করতে এই জাল দলিলের মোকদ্দমা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমার যে সকল গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন তার তদন্ত আর কখনোই হলো না। শেষ হলো এক নির্মম অধ্যায়। মহারাজা নন্দকুমারকে প্রাণ দিয়ে সেই অধ্যায় শেষ করতে হয়েছিল।

* * *

১৭৮৫ সালে হেস্টিংস ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে গেলেন। তখন তিনি ধনকুবের। কিন্তু তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির অধিকারী হেস্টিংস জানতেন ইংল্যান্ডে তার অনেক অনাচারের কথা পৌঁছে গেছে। তাই সেখানে পৌঁছানো মাত্রই তিনি রাজা তথা রাজমন্ত্রীদের মণি-রত্ন উপহার দিয়ে নিজের দলে টানার চেষ্টা করলেন। সকলেই খুশি হলেন এতে। হেস্টিংস নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু ওই যে বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়।

হেস্টিংস জানতেন না তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন বিখ্যাত বাগ্মী, রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক।

বার্ক পার্লামেন্টে মহাসভাকে হেস্টিংসের ভারতবাসীর উপর উৎপীড়নের অভিযোগগুলো একে একে উপস্থাপন করলেন। অভিযুক্ত হেস্টিংসকে রিমান্ডে নিতে প্রস্তাব দিলেন।

এবার কলিকাতা কাউন্সিলের স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস তখন সেই মহাসভার একজন সভ্য। হেস্টিংসের অনাচারের কথা দেশবাসীকে জানাতে তিনি মহামতী বার্ককে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফক্স, শেরিডানের মতো তৎকালীন রাজনৈতিক বক্তারাও একে একে যোগ দিলেন। পার্লামেন্টের কমন্স সভায় বার্কের প্রস্তাব গৃহীত হল এবং হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করাই স্থির হল।

পার্লামেন্টের ওয়েস্টমিনস্টার হলে শুরু হলো হেস্টিংসের বিচার। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মহারাজ নন্দকুমারের মতো তিনিও অভিযুক্ত হলেন কুড়িটি অভিযোগে। এর মধ্যে রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎ সিংহের সম্পত্তি লুণ্ঠন, মহারাজা নন্দকুমারের আইনি ফাঁসি, অযোধ্যার বেগমদের অর্থ লুণ্ঠন, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ ছিল।

চারদিকে এই ঘটনায় এক আলাদা উন্মাদনার সৃষ্টি হলো। হেস্টিংসের স্বেচ্ছাচারের কাহিনি শোনার এবং তাঁর বিচার প্রক্রিয়া দেখার জন্য ইংল্যান্ডের চারদিক থেকে পদস্থ মানুষজন আসতে লাগলেন। ব্রিটিশ মহিলারা দলে দলে যোগ দিলেন। সকলেই বার্ককে শ্রদ্ধা করতেন। শেষে ব্রিটিশ ভারতের হর্তা কর্তা বিধাতা এবং বর্তমানে বিচারের আসামি ওয়ারেন হেস্টিংস ওয়েস্ট মিনিস্টার হলে প্রবেশ করলেন। হেস্টিংস হাঁটু ভেঙে নিজের মাথা থেকে টুপি খুলে সকলকে অভিবাদন জানালেন।

বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ হল।

বার্কের বাগ্মিতা অসাধারণ। তিনি তাঁর তেজস্বীতায় ভর করে হলভর্তি মানুষের সামনে হেস্টিংসের মুখোশ খুলে ফেলতে শুরু করলেন। হেস্টিংসের নেতৃত্বে কোম্পানি বাহিনি যেভাবে ভারতের নরনারীর উপর শোষণ করেছে তা সবিস্তার তিনি তাঁর দেশীয় লোকেদের কাছে তুলে ধরতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটা কথা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রমাণ তিনি উত্থাপিত করলেন। ভারতবর্ষের মানুষ হেস্টিংসের অপশাসনে কীভাবে দিনপাত করেছিল তা জেনে বহু ইংরেজ রমণীর চোখে জল চলে এলো। ইতিহাস বলছে এই প্রক্রিয়া চলাকালীন শেরিডানের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন নিপীড়িত ভারতবাসীর কথা জানতে পেরে।

এই বিখ্যাত বিচার চলেছিল দুই বছর। ততদিনে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস আর সভ্য রইলেন না। পুরাতন বহু সভ্য পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নির্বাচনে ফলাফল বার্কের দলের পক্ষে থাকলো না। এমনকী, তিনি হেস্টিংস ও এলাইজা ইম্পের বন্ধুত্বের কারণে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছে এই কথা বলেছিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধেও দোষারোপ করা হলো পার্লামেন্টে। তবে তিনি বিচলিত হলেন না। কিন্তু বিচার নিয়ে ততদিনে সকলের আগ্রহ তলানিতে ঠেকেছে।

হেস্টিংস এরকম পরিস্থিতির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আসলে হেস্টিংস কখনো ভাবেননি তাঁর নিজের দেশে ফিরে যাওয়া মাত্র তাঁকে এরকম এক পরিস্থিতি সামলাতে হবে। তাঁর সঙ্গেও ক্লাইভের মতোই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছিলো। কিন্তু তাঁর কাছে অর্থ ছিল। তিনি কোনো কার্পণ্য না করে সেই অর্থ স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বর থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তখনকার দিনের সাময়িকপত্রের সম্পাদক থেকে শুরু করে লেখক সকলকে নিজের দলে টেনে নিয়েছিলেন অর্থের প্রলোভনে। ফলে তাঁর পক্ষে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বেরোতে লাগলো নিয়মিত। ভারতে তাঁর নীতি ও কাজকর্মকে সমর্থন করে বই বেরোলো। চারদিকের জনমত হেস্টিংস নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিলেন।

সাত বছর ধরে বিচার চললো। বার্ক ও তাঁর সহচরগণ অক্লান্ত চেষ্টা করেও চির অনুদারপন্থী লর্ডস সভার সভাগণের কাছে হেস্টিংসকে আসামি সাব্যস্ত করতে পারলেন না। ওয়ারেন হেস্টিংস নির্দোষ সাব্যস্ত হলেন। যদিও কমন্স সভা হেস্টিংস সম্পর্কে তাদের নির্ধারণ প্রত্যাহার করলো না।

হেস্টিংসের বিচার কাহিনি ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে থেকে গেছে। ইংরেজি সাহিত্যে বার্কের বাগ্মিতা এক অসাধারণ সম্পদ।

বিচারকেরা স্যর এলাইজা ইম্পেকেও অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কমন্স সভায় অভিযোগ উত্থাপিতও হয়েছিল। কিন্তু হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধুদের চেষ্টায় তা কোনোদিন সফল হয়নি।

* * *

আর এভাবেই ধীরে ধীরে ইতিহাস সবাইকে ভুলে গেলো। তবু আজকেও কলকাতার বুকে হেস্টিংস মোড় দাঁড়িয়ে আছে। তার অনতি দূরত্বে ফাঁসি হয়েছিল মহারাজা নন্দকুমারের। সেই কুয়োটা ফাঁসিকল সহকারে এখন রয়ে গেছে। কেউ চাইলে দেখে আসতেই পারেন। স্যর এলাইজা ইম্পের ছবি রয়েছে আমাদের কলকাতার আদালত গৃহে। মহারাজা নন্দকুমারের নামে রয়েছে মহাবিদ্যালয়।

মানুষগুলো আর কোথাও নেই। তবু এই শহরে ছড়িয়েছিটিয়ে

রয়ে গেছে তাঁদের স্মৃতি। একসময়ের ধুন্ধুমার যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। ইতিহাসও মনে রাখে না সেই যুদ্ধ। ইংল্যান্ডেশ্বর বনাম মহারাজা নন্দকুমার সেরকম এক যুদ্ধের নাম। যে যুদ্ধে এই আজকের শহর কলকাতা কেঁপে উঠেছিল। প্রকাশ্য ফাঁসিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এই শহর। কলকাতার ফ্যান্সি লেনে চলতো সেইসব প্রকাশ্য ফাঁসি। ফাঁসির পর দু-তিনদিন ঝুলে থাকতো মৃতদেহ। যেন কেউ আর সাহস করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আওয়াজ না তোলে।

তবু আওয়াজ উঠেছিল। বহু বলিদানের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল ১৯৪৭ সালে। দেশ ভাগের দুঃখ বয়ে এনেছিল এই স্বাধীনতা।

মহারাজা নন্দকুমার এইসব দেখে যেতে পারেননি। শুধু ইতিহাস পরীক্ষার একটা প্রশ্ন হয়ে থেকে গেছেন তিনি।

প্রশ্ন: পরাধীন ভারতের প্রথম ফাঁসি কার হয়েছিল?

উত্তর : মহারাজা নন্দকুমার।

